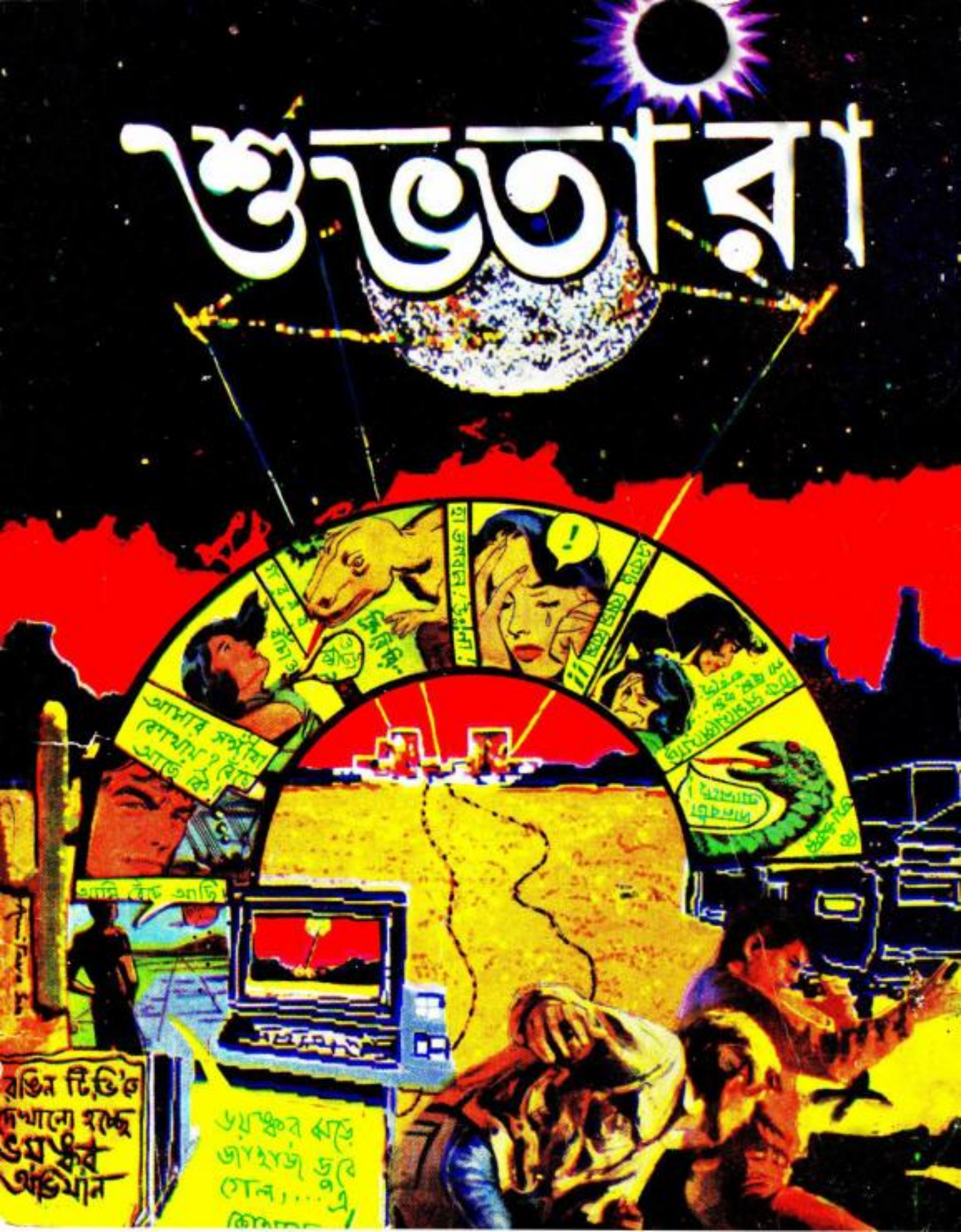

শুকতারা
রঙিন টি.ভি.'তে দেখানো হচ্ছে ভয়ঙ্কর অভিযান
ভয়ঙ্কর ঝড়ে জাহাজটা ডুবে গেল,... এ
আমি বেঁচে আছি

দি গ্রেট মোটু
মৈত্রেয়ী বিশ্বাস
একদিন স্কুলে—
মোটুকে আজ খুব হাসি খুশি দেখাচ্ছে!
গোমড়া মুখো!
ফোঁত! ফোঁত! মুখোশের আড়ালে দিব্বি ঘুমাবো?
আজ অঙ্ক নয় পর্বত অভিযান সম্বন্ধে ছবি দেখাবো!
পর্বত অভিযান দারুণ হবে।
আঁ! আঁ! ছুটো মোটু! রাত জাগার কুফল!
ছবি দেখানো শুরু—
সব অভিযাত্রীই এভারেস্টে উঠতে চায়!
ঘর ঘর!
কি মজা! পাহাড়ে চড়ে বিখ্যাত হতে হবে!
জিয়োগ্রাফি ক্লাসে মোটু প্রশ্ন করে :— স্যার!
মাউন্ট এভারেস্ট কোন দেশে?
নেপালে মোটু!
ন' নম্বর বাস কি নেপালের পাশ দিয়ে যায়?
এই; আমার বুক-কেস উঠো না!
সব থেকে উঁচু হিমালয় পাহাড় থেকে শুরু করবো!

[পরের অংশ ৫ পৃষ্ঠায়]

শুভতারা

প্রথম বর্ষ 'শুভতারা' প্রথম সংখ্যা ১৩৯০

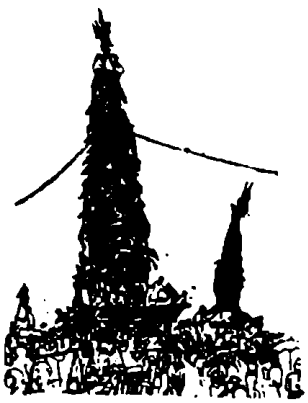

রথযাত্রার শুভদিনে আমাদের যাত্রা হ'ল শুরু

সম্পাদক : *অমিতাভ সেন*

১২।৭।৮৩

নটরাজ প্রকাশনের পক্ষে নির্মল চন্দ্র ব্যানার্জী কর্তৃক ১/সি দুর্গা পিথুরী লেন, কলিকাতা ৭০০০১২ থেকে প্রকাশিত এবং মুদ্রিত।
মুদ্রণ : ইম্প্রেশন, কলি-৬
জয়শ্রী প্রেস, কলি-৬
প্রচ্ছদ মুদ্রণ : নিউগল্পা আর্ট প্রেস, কলি-৯
ব্লক : রয়েল হাফটোন
** শুভতারা : ২৭ বৌবাজার স্ট্রীট, কলি-১২
মূল্য : ২ টাকা ৫০ পয়সা। Rs. 2·50

বিশেষ রচনা

গ্রেট ব্রিটেনে প্রস্তর যুগের মানুষ (ইংরেজি ভাবানুবাদ)। ডঃ সুপ্তি সেন / ৬০
জাদু-সম্রাট ওজ (সচিত্র)। পূর্ণেন্দু সেন / ২৪
ব্রুস লীর ইচ্ছা-শক্তি। শ্রীপার্থ / ৫৫

বড় গল্প

বাঘ ও কেষ্টঠাকুর। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় / ৮
ভূত্রাক্ষস। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ / ১৯
বীর পুরুষ। ডাঃ অভিজিৎ দত্ত / ৪৭

উপন্যাস

একচক্ষু দানব। শ্রীধর সেনাপতি / ২৭
অন্ধকার হোটেলের অতিথি। রহস্যময় রায় / ৩৮
সখের খুদে গোয়েন্দা। মানবেন্দ্র পাল / ৬৩

কল্প-বিজ্ঞান

আশ্চর্য তারা। অদ্রীশ বর্ধন / ৫১

গল্প

বিস্ময়কর এক গুণিন। বীরু চট্টোপাধ্যায় / ৪৩
ভয়ঙ্কর সেই রাত। মঞ্জিল সেন / ৪৫
হাইজ্যাক। পুলক দেবনাথ / ১১

চিত্রে কাহিনী (কমিকস)

মহাকাশে বিপদ সংকেত। অমিতাভ সেন। ১৫
দি গ্রেট মটু। মৈত্রেয়ী বিশ্বাস / ২
শয়তান ও টারজান। অভীক মিত্র / ৫৮
পড়ার টেবিল····। সম্রাট সেন / ৭৫

বুদ্ধির খেলা, শব্দমালা, খেলাধুলা, অনুসন্ধান

ভারত বিশ্বজয়ী। আশিষ গাঙ্গুলী / ৬
শব্দমালা। বিষ্ণু দত্ত / ৭৩
বুদ্ধির খেলা। রেখা রক্ষিত / ৭৩
অনুসন্ধান। চন্দন বসু / ৭৪
মজার কার্টুন ॥ ৬৮ চিঠি এবং জবাব ॥ ৭২

মটু দি গ্রেট / মৈত্রেয়ী বিশ্বাস

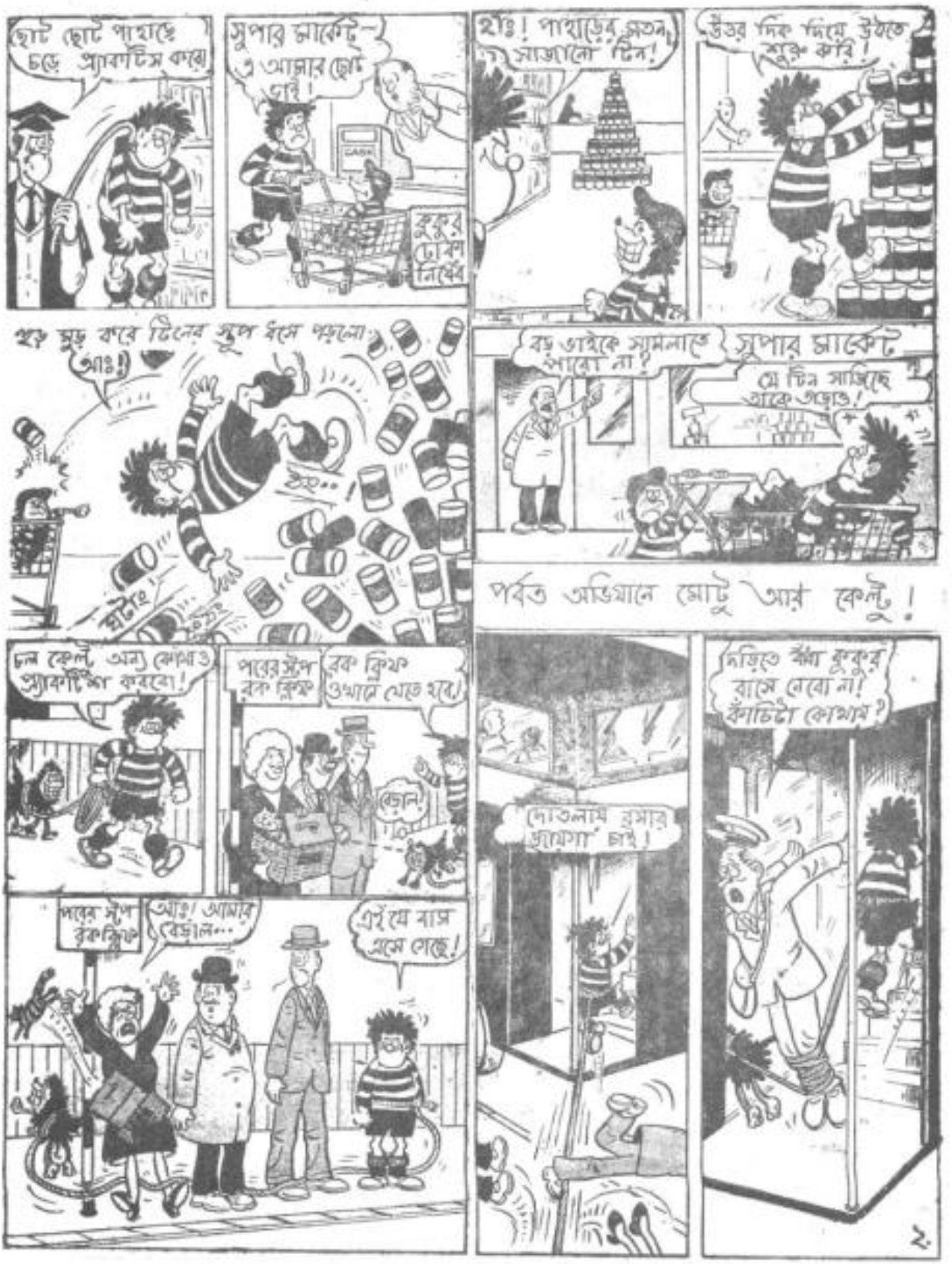

হিমঘরে মোটু আর কেল্টু
দূর হও!
রকওয়্যাকটোরি
ঠিক জায়গায় পৌঁছেছি— পাহাড়ে উঠবো!
থরে থরে সাজানো ওঠা খুব সোজা!
হাতের গোড়ায় খাবার
মোটু বাক্স ভেঙে খেতে লেগেছে
হাঃ! কেল্টু ও এ খাবার পছন্দ করে!
ওদিকে ধস শুরু হয়েছে—
গুড়ুড় গুড়ুড়...!
দড়াম!
তবেরে? আয় এদিকে—
উহ্‌! ওদিকে যাচ্ছি না
হঠাৎ শীত শীত করছে!
ঠাণ্ডা বাতাস
হাঃ হিম ঘর! মিসবাহের মতন!
কোল্ড স্টোর
পালা কেল্টু, পালা...
ঐ পথে
৩.

ভারত বিশ্বজয়ী

আশিষ গাঙ্গুলী

পৃথিবীর ইতিহাসে মধ্যরাত্রি ঠিক কতগুলি স্মরণীয় অধ্যায়ের সূচনা করেছে আমার জানা নেই তবে শনিবার রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে ভারতের ক্রিকেটের ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় অধ্যায়ের সূচনা ঘটল—ভারত গত দুবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে পরাজিত করে নূতন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হল। নাটকীয় জয়ের জন্য উপযুক্ত ক্রীড়াযুগের প্রয়োজন ছিল এবং ঠিক সেই জন্যই লর্ডসেই ভারতের পতাকা উঠল।

সাঁধু ২ উইকেট

ভারত যে যোগ্য দল হিসাবে জিতেছে, এ নিয়ে আর কোনো বিতর্ক উঠতে পারে না। পরপর তিনটি ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে পরাভূত করা নিশ্চয়ই অসাধারণ কৃতিত্ব।

মনে রাখতে হবে, ভারতের এ জয় ইংল্যাণ্ডের মাঠে। সব থেকে বড় কথা, ভারত—রিচার্ডস, বোথাম, বা ইমরানের দলের মত ব্যক্তি-বিশেষের ওপর নির্ভরকারী দল নয়। এখানে তারা দল হিসাবে খেলেছে। অন্য দেশগুলি ব্যক্তি-বিশেষের দক্ষতার উপরই নির্ভরশীল ছিল। তাই, রিচার্ডসের ব্যর্থতা মানেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যর্থতা। ভারতের জয় সেজন্য আবার প্রমাণ করে দিল ক্রিকেট এগারো জনের খেলা—একজনের নয়। চায়ের আগে ভারতীয় বোলারদের বিশেষ করে মদন-লালের অনুপ্রাণিত বোলিং ম্যাচ জেতার তুল্য-মূল্য সুযোগ এনে দেয়। কেননা জয়ের লক্ষ্যে পৌছতে যখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১২৬ রান বাকি তখন তাদের পাঁচ ব্যাটসম্যান প্যাভিলিয়নে ফিরে গেছে। এদের মধ্যে ছিল ভিভ রিচার্ডস, যে ৩৩ রানে মদন-লালের বলে মিড উইকেটে ক্যাচ তুলে ফিরে যায়। ক্যাচটা অবশ্য কপিল এক চক্কর দৌড়ে সহজেই ধরে। প্রায় অন্ধকারময় পরিবেশ এবং সিমিং উইকেট—ভারতীয় পেসাররা তীব্র গতিদ্বারা তাদের বিপক্ষের বোলারদের থেকেও বেশি কাজে লাগিয়েছে। প্রথম ফিরে গেল গরডন গ্রিনিজ সরাসরি বোল্ড হয়ে সাঁধুর বলে।

অমরনাথ ২৬: মদনলাল ৩ উইকেট

সাঁধু দুদিকেই বল ঘোরাতে পারে। গ্রিনিজকে যে বলে সে আউট করে সেটি অফ স্ট্যাম্পের বাইরে পড়ে ভেতরে ঢুকেছিল। সাঁধু বেশ কয়েকটি ওয়াইড বল করে রান দিয়েছে। এই সময়ে এইভাবে রান দেওয়া তার উচিত হয়নি। সাঁধু যেন দায়িত্ব দিয়ে গেল মদনলালের ওপর। মদন-লাল অনেক অভিজ্ঞ বোলার—

ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়ায় ভালরকম রপ্ত। কেননা সে দীর্ঘদিন ল্যাংকাশায়ার লীগে খেলেছে। কপিলের চমৎকার চালেই ফল পাওয়া গেল।

অমরনাথ ৩ উইকেট

মদনলালের আউট সুইংগারকে ঠিকমত খেলতে না পেরে কভারে বিন্নির হাতে ধরা পড়ল হেনেস। তারপর মদনলালের শিকার বাঁহাতি গোমস। বল ব্যাটে লেগে ফুলকি দিয়ে যেন ধরা পড়ল স্লিপে গাভাসকরের হাতে। লয়েড তখনও ছিল। ফিল্ড করার সময় ছোটাছুটিতে তার কুঁচকির ব্যথা বেড়েছিল। সেজন্য সে রানার নিয়ে নামে। একবার বিন্নিকে দুর্দান্ত কভার ড্রাইভ করেওছিল। কিন্তু পরে ওইভাবে আবার ড্রাইভ করার চেষ্টা

শ্রীকান্ত ৩৮, পাতিল ২৭

করে—অবশ্যই বলের লাইনে না গিয়ে—কপিলের হাতে ধরা পড়ল। এটি ছিল কপিলের দ্বিতীয়

ক্যাচ। ৬৬ রানে পাঁচ উইকেট—ম্যাচ যে কোনো দিকে ঢলে পড়তে পারত।

ভারতীয়দের এত লড়াই করার প্রয়োজনই হত না, যদি তারা এলোমেলো ব্যাটিং না করত। শ্রীকান্ত শুরু ভালই করেছিল। পরের দিকের ব্যাটসম্যানদের উচিত ছিল বুক চিতিয়ে সেই সুযোগ কাজে লাগানো। কিন্তু মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভুল করে ম্যাচটি প্রায় ভারতের হাত ছাড়া করে দিয়েছিল। শ্রীকান্ত ৩৮ রান করেছে। ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে এটিই সর্বোচ্চ রান। মাত্র ৫৪'৪ ওভারেই ভারতীয় ইনিংসটি ধসে পড়ল।

অফ স্পিনার গোমসের বল থেকেই ভারতীয়দের ফসল তোলা উচিত ছিল। তাড়াহুড়ো না করেও তারা সেটা করতে পারত।

কপিলদেব ১ উইকেট

শ্লথগতির এই বোলার এগারো ওভারে ৪৯ রান দিয়েছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পেস বোলাররা তাদের দক্ষতার জন্য নয়—ভারতীয়দের দুর্বল ব্যাটিংয়ের জন্যই কম রান দিয়েছে এবং উইকেট পেয়েছে।

বিনি ১ উইকেট

সাঁধু সোজা ব্যাটে যেভাবে খেলেছে, তা সত্যিই আশ্চর্যের। কিরমানির জুড়ি হিসাবে সে কিন্তু অতীব প্রয়োজনীয় ২২ রান যোগ দিয়েছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

মধ্যপ্রদেশে মাণ্ডু নামে একটা জায়গা আছে। বড় সুন্দর জায়গা। এই মাণ্ডু ছিল আগেকার দিনের একটি রাজ্যের রাজধানী। পাহাড়ের ওপর দেওয়াল দিয়ে ঘেরা পুরো একটি শহর। সেখানে দুর্গ আছে, রাজা-রাণীদের বড় বড় প্রাসাদ আছে, রয়েছে কয়েকটা মন্দির আর মসজিদ, কিন্তু সবই পরিত্যক্ত। অনেকদিন সেখানে মানুষ বাস করে নি।

এখন সারা ভারতবর্ষ থেকে লোকেরা সেই জায়গাটা দেখতে যায়। বড় বড় দিঘি আছে সেখানে, ঠিক হ্রদের মতন, আর শীষ মহল, জাহাজ মহল নামের বিরাট বিরাট প্রাসাদগুলো সত্যিই দেখবার মতন। মনে হয় যেন রূপকথার এক ঘুমন্তপুরী।

টুরিস্টদের জন্য দু' একটা হোটেলও হয়েছে অবশ্য এখন। আমরা কয়েকজন উঠেছিলুম একটি অতিথিশালায়। এই বাড়িটাও আগেকার দিনের কোনো মন্ত্রী বা সেনাপতির বাড়ি ছিল নিশ্চয়ই। এখন সেটা অতিথিশালা হয়েছে।

বাড়িটার সামনে-পেছনে দুটো বেশ বড় বড় বাগান। পেছনের বাগানটা যেখানে শেষ হয়েছে, তার পরেই পাহাড়ের গভীর খাদ নেমে গেছে। উলটো দিকেও একটা পাহাড় দেখা যায়, সেটা নিবিড় জঙ্গলে ভরা।

গ্রীষ্মকালের রাত, আকাশ ভর্তি তারা। আমরা সেই পেছনের বাগানটায় শতরঞ্জি পেতে বসলুম, সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, তার মধ্যে শুরু হলো গান। আমার বৌদি ভালো গান করেন আর বৌদির এক বান্ধবী এসেছেন। তিনি তো শান্তিনিকেতনে গান শেখান।

বেশ যখন গান বাজনা জমে উঠেছে, সেই সময় দেখি যে একটা দশ-এগারো বছর বয়েসের ছেলে কাছেই একটা গাছ তলায় দাঁড়িয়ে এক মনে গান শুনছে। ছেলেটির গায়ের রং কুচকুচে কালো, মালকোচা মেরে একটা ধুতি পরা, খালি গা। আজকাল আমরা ঐ বয়েসের সব ছেলেকেই প্যাণ্ট পরতে দেখি, ধুতিপরা ছেলে দেখলে মজা লাগে।

ছেলেটার মুখখানা বেশ মিষ্টি। ছেলেটি হাত দু'খানা পেছনে রেখে ছিল, একবার একটা হাত সামনে আনতেই দেখি, তার হাতে একটা বাঁশী।

বৌদির বান্ধবী সুলেখাদি একসময় গান থামিয়ে ছেলেটির দিকে হাতছানি দিয়ে বললেন, এই, ইধার আও তো!

ছেলেটি দু' চার পা এগিয়ে এসে থেমে গেল।

সুলেখাদি জিজ্ঞেস করলেন, তুমহার নাম কেয়া?

ছেলেটি বললো, কিষণ্!

বৌদি বললেন, কিষণ মানে তো কৃষ্ণ। ছেলেটিকে দেখতেও ঠিক যেন ক্যালেণ্ডারের কেষ্টঠাকুরের মতন। মাথায় শুধু ময়ূরের পাখা নেই।

সুলেখাদি বললেন, হাতে আবার বাঁশী রয়েছে। এই তুমি বাঁশী বাজানে জানতা? বাজাও না।

ছেলেটি কিন্তু কোনো উত্তর দিল না। বাঁশীটাও মুখের কাছে তুললো না।

সুলেখাদি বললেন, ও বোধহয় আমাদের কথা বুঝতে পারছে না? বাঁশীর হিন্দী কী?

তখন কেউ বললো বংশী, কেউ বললো বাসরি, কেউ বললো, বানসী। ছেলেটা কিন্তু কিছুই বুঝলো না।

তখন আমি উঠে গিয়ে ছেলেটির কাছে গিয়ে মুখের সামনে দুটো হাত বাঁশী বাজাবার ভঙ্গিতে তুলে ওকে বললুম, বাজাও না। থোড়া বাজাও।

ছেলেটি এবারে বাঁশীটা তুললো। প্রথমে একটা ফুঁ দিয়েই তারপর একটা সুর ধরলো, আমরা সবাই অবাক। সে একটা রবীন্দ্রনাথের গানের সুর বাজাচ্ছে, যে গানটা সুলেখাদি একটু আগেই গাইছিলেন। গানটা হলো, "আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ।" ছেলেটা কি একবার শুনেই সুরটা তুলে ফেললো?

আমার দাদা বললেন, না, না, ও নিশ্চয়ই আগে থেকেই সুরটা জানতো। তোমাদের চমকে দিয়েছে। সুলেখা, আর একটা গান গাও তো, দেখি, সেটার সুর ও বাজাতে পারে কি না!

সুলেখাদি আর একটা ধরলেন। কিষণ তার সঙ্গে বাজাতে লাগলো। একেবারে নিখুঁত সুর না হলেও ও মোটামুটি বেশ বাজিয়ে গেল।

গানটা শেষ হবার আগেই দূর থেকে কে যেন ডাকলো, কিষণ! এ কিষণুয়া!

ছেলেটা সেই ডাক শুনেই তার বাঁশীটা কোমরে গুঁজে দৌড়ে চলে গেল।

বৌদি বললেন, ছেলেটা বেশ ভালো বাজায় কিন্তু। ঐ টুকু মোটে বয়েস!

সুলেখাদি বললেন, কোনো ভালো গুরুর কাছে শিখলে ও আরও উন্নতি করতে পারতো! কিন্তু এই রকম জায়গায় কে ওকে শেখাবে!

দাদা বললেন, ছেলেটিকে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যাও না! শান্তিনিকেতনে ভর্তি করে দেবে!

সুলেখাদি বললেন, ও কি যাবে আমাদের সঙ্গে?

একটু পরেই সেই অতিথিশালার চৌকিদার এসে হাজির। সে হাত জোড় করে বললে, বাবু, আপনারা এখানে বসবেন না। আপনারা বাড়ির মধ্যে যান। এখানে বসার বিপদ আছে।

আমি অবাক হয়ে বললুম, কী বিপদ? ঘরের মধ্যে গরম, বাইরে বসলে ক্ষতি কী?

চৌকিদার বললো, বাঘ আসতে পারে!

আমরা সবাই একসঙ্গে বললুম, বাঘ?

চৌকিদার বললো, হাঁ বাবু। এখানে যখন তখন বাঘ এসে পড়ে। এই পাহাড়ের জঙ্গলে বাঘ আছে। ছ' মাহিনা আগে এই তো একটু দূর থেকে টুরিস্টবাবুদের এক জেনানাকে বাঘে ধরে নিয়ে গেছে। তারপর থেকে এখানে রাত আটটার পর কারুর বসা নিষেধ।

বাঘের নাম শুনেই দাদা-বৌদিরা উঠে দাঁড়িয়েছে। আমার কেমন যেন অবিশ্বাস্য লাগছিল। চারদিকে এত আলো জ্বলছে, এর মধ্যে কখনো বাঘ আসতে পারে?

কিন্তু চৌকিদার এমন ভয় দেখাতে লাগলো যে আমাদের বাড়ির মধ্যে চলে যেতেই হলো।

একটু বাদে আমরা যখন খেতে বসেছি তখন সুলেখাদি চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করলেন, ঐ যে কিষণ বলে একটা বাচ্চা ছেলে বাঁশী বাজায়, ও কি তোমার ছেলে?

চৌকিদার জানালো যে কিষণ ওর ছেলে নয়, ওর দাদার ছেলে। সেই দাদা মারা গেছে বলে কিষণ এখন তার কাছেই থাকে।

সুলেখাদি বললেন, ঐ ছেলেটাকে আমাদের সঙ্গে যেতে দেবে? আমরা ওকে নিয়ে গিয়ে লেখাপড়া আর গান বাজনা শেখাবো।

চৌকিদার হঠাৎ চটে গিয়ে বললো, কেন? ও আপনাদের সঙ্গে যাবে কেন? ও কি এখানে খেতে পরতে পায় না? ও কেন বাবুদের বাড়ি নোকরি করবে!

সুলেখাদি যতই বোঝাতে চান যে তিনি ওকে চাকর হিসেবে নিয়ে যেতে চাইছেন না, ওকে গান-বাজনা শেখাবেন, সে কথা চৌকিদার কিছুতেই বুঝলো না। সে খালি বলতে লাগলো, ঐসব কথা বলবেন না। আমি কিষণকে কোথাও পাঠাবো না।

আমরা সবে আঁচিয়ে উঠেছি এমন সময় একজন লোক ছুটতে ছুটতে এসে বললো, বাবুরা আজ আর বাইরে যাবেন না। একটা শের বেরিয়েছে, মস্ত বড় শের!

আমরা সবাই দোতলায় উঠে জানলার খড়খড়ি খুলে রইলুম, যদি বাঘ দেখা যায়।

অতিথিশালার সব গেটে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। চারদিক একদম নিস্তব্ধ। হঠাৎ চারদিক কাঁপিয়ে বাঘের গর্জন শোনা গেল।

সেই গর্জন শুনে আমরা সবাই জানলা ছেড়ে হুড়মুড় করে দূরে পালিয়ে গেলুম। বাঘটা যেন খুব কাছ থেকেই ডেকে উঠলো।

চিড়িয়াখানার বাঘের ডাকের চেয়ে এই বাঘের ডাক অনেক জোরালো। আমরা দোতলার ওপরে দরজা-টরজা বন্ধ করে রয়েছি, আমাদের কোনো বিপদই নেই, তবু ঐ রকম বাঘের ডাক শুনলে ভয় করে।

একটু পরে আবার জানলার কাছে এসে খড়খড়ি খুলে চেয়ে রইলুম। পেছনের বাগানটা একেবারে ধপধপে সাদা হয়ে আছে জ্যোৎস্নায়। বাঘ সেখানে এলে ঠিক দেখতে পাবো।

অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে যখন প্রায় চোখ ব্যথা হয়ে এসেছে, তখন আবার আমরা চমকে উঠলুম। বাগানে জ্যোৎস্নার মধ্যে একটা ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিশ্চয়ই কিষণ।

বৌদি আর সুলেখাদি একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন, কিষণ, এ কিষণ, শিগগির ভেতরে আও। বাঘ নিকলা। ভেতরে চলে আও! (বাকী ১৪ পৃষ্ঠায়)

পুলক দেবনাথ

লণ্ডন থেকে প্লেনটি ছাড়ল কলকাতা অভিমুখে। বিকাশ তার বাবা-মা'র সাথে লণ্ডন গিয়েছিল ওর দাদার ওখানে বেড়াতে। দাদা ওখানকার একটা নামকরা ফার্মের এঞ্জিনীয়ার। পনেরো দিন ওরা ওখানে ছিল। দিনগুলো ঘুরে ঘুরে বেশ উপভোগ করা গেছে। বিকাশকে ওর দাদা লণ্ডন থেকে কিনে দিয়েছে ক্রিকেট ব্যাট, বল, খেলনা পিস্তল, সুন্দর সুন্দর পুতুল···। আরো কত কী! সেগুলো নিয়ে বিমানে বসেই বিকাশের কী আনন্দ!

হঠাৎ একটা ভয়ংকর কাণ্ড ঘটে গেল। প্লেন তখন সবে ইংলণ্ডের আকাশ ছাড়িয়েছে। হঠাৎ বিকাশের পাশে বসা কালো কোট, চশমা ও টুপি পরিহিত—সাদা চামড়ার সাহেব-লোকটা ছুটে গেল ককপিটে। পাইলটের দিকে সহসা পিস্তল উঁচিয়ে চিৎকার করে ঘোষণা করে উঠল—দিজ্ প্লেন ইজ নাউ হাইজ্যাকড্! প্লেন যাবে ঢাকা। পাইলটকে আরো বলল—প্লেন ঠিকমতো ঢাকা নিয়ে চলো। নয়তো এই পিস্তল দেখছ, মাথার খুলি উড়ে যাবে!

হাইজ্যাকারটি এতক্ষণ বিকাশের পাশে তার সাথে কত গল্প করছিল। খেলনাগুলো যখন এয়ারপোর্টে ব্যাগের মধ্যে ভাল করে রাখছিল, লোকটা তখন থেকেই বাবা-মা'র সাথে বিকাশের সঙ্গেও আলাপ শুরু করে। কত কথা! কোথায় যাওয়া হচ্ছে? কোথায় গেছিলে? কার কাছে গেছিলে? কেমন বেড়ালে? লণ্ডন কেমন লাগল? দেশে কি কি কিনে নিয়ে যাচ্ছ?···আরো কত কী! এত উদার স্বরে ও প্রাণ-খোলা মনে কথা বলে লোকটা সত্যিই দারুণ ভাব জমিয়ে ফেলেছিল। বিকাশ ভেবে পায় না, এত মিষ্টি কথা বলার লোকটা কী করে মুহূর্তে এত ভয়ংকর হয়ে উঠল! এ-কথা ভেবেই বিকাশ কেঁদে ওঠে।

ততক্ষণে প্লেনের অন্যান্য যাত্রীরাও কঠিন ভয়ে চুপ্‌সে গেছে। মনে মনে সবাই ততক্ষণে যার যার ঈশ্বরকে ডাকতে ব্যস্ত। বিকাশের মা-বাবা বিড়্‌বিড়্ করে ভগবানের নাম জপ্‌ছে! এয়ার-হোস্টেস সকলকে ততক্ষণ সামলায়।

হাইজ্যাকারটি রূঢ় কর্কশ স্বরে বলে ওঠে—প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে কেউ চেঁচামেচি করবেন না। প্লেন হাইজ্যাকড্ হয়ে গেছে। ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে আমি দশ হাজার ডলার চাই। দাবী *মিটলে আপনাদেরও মুক্তি। নয়তো····।*

বাকীটা না বলেই হাইজ্যাকারটি একটু ক্রুর হেসে বিকাশের দিকে কট্‌মট্‌ করে তাকায়—এই বাচ্চা, কাঁদছ কেন? কাঁদবে না। হাতে দেখছ এই বোমাটা! একদম প্লেনসুদ্ধ সকলকে উড়িয়ে দেব। কান্না চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। বলেই লোকটা হো হো করে হেসে ওঠে।

যাত্রীরা সকলেই ভয়ে বরফ। কারো মুখে 'টু' শব্দটি নেই। শুধু এ-ওর দিকে ভয়ে ভয়ে চাওয়া-চায়ী করছে।

এয়ার-হোস্টেসের দিকে তাকিয়ে হাইজ্যাকারটি বিকাশের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলল, ম্যাডাম! ঐ-বাচ্চাটাকে কুইক্‌লি সামলান। আমার মেজাজ কিন্তু বিগড়ে যাচ্ছে!

এয়ার-হোস্টেস তাড়াতাড়ি একমুঠো লজেন্স বিকাশের হাতে দিয়ে একটু আদর করে সামলাতে চেষ্টা করে—কাঁদে না। লক্ষ্মীটি! চুপ্‌চাপ্‌ বসে থাকো। দেখছ না সবাই কেমন চুপ্‌চাপ্‌ বসে অছে।

বিকাশের মা-বাবাও বিকাশকে চুপ করাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন।

—তুমি এত নিষ্ঠুর! এতক্ষণ তবে আমার সাথে অভিনয় করছিলে! তুমি আমাকে একটুও ভালোবাসো না! হাইজ্যাকারটির দিকে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বিকাশ বলে ওঠে।

হাইজ্যাকারটির চোখের কোণ দু'টো যেন একটু চিক্‌চিক্‌ করে! হাসতে হাসতে বলে—এই বাচ্চা! চুপ্‌চাপ্‌ থাকো। বন্ধু যখন ছিলাম তখন, এখন আমি এই প্লেনের সবার শত্রু। তোমারও! আপনারা যে যেখানে বসে আছেন, বসে থাকুন। একটুও নড়বেন-চড়বেন না। পিস্তল কিন্তু তাহ'লে গর্জে উঠবে!

প্লেন নীল আকাশ দিয়ে সোঁ-সোঁ বেগে উড়ে চলে। বিকাশের ভীষণ দুঃখ হল—একটা লোকের কাছে তারা অসহায়! পৃথিবীর কোটি কোটি লোকের কেউ কি এই বিমানদস্যুর কাছ থেকে তাদের মুক্ত করতে আসবে না!

হাইজ্যাকারটি পাইলটকে তাড়া দেয় একবার—ঢাকা আর কতদূর?

—আর একঘণ্টা! পাইলটের চোখে-মুখেও আতঙ্কের ছাপ।

বিকাশ কাতরস্বরে অনুরোধ করে পাইলটকাকু আমরা কলকাতা যাব। আমাদের কলকাতা নিয়ে চলো।

—এই বাচ্চা! চুপ্‌ থাকো। হাইজ্যাকারটি রাগে গনগনে হয়ে যায়।

—তুমি কি আমাদের সকলকে মেরে ফেলবে!

—ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট আমায় দশহাজার ডলার না দিলে···।

—কিন্তু আমরা তো কোন দোষ করিনি!

—ওসব বুঝি না। বাচ্চাটির মা-বাবা ওকে সামলান। ও কিন্তু বড্ড বেশী কথা বলছে। এমন করতে থাকলে ওকে আমি এই শূন্য থেকে নীচে ফেলে দেব!

বিকাশের মা-বাবার বুক ধক্‌ করে ওঠে একটা গাঢ় ভয়ে—প্লীজ। আপনি কিছু মনে করবেন না। ওকে চুপ্‌ করাতে আমরা চেষ্টা করছি। এয়ার-হোস্টেস, অন্যান্য যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ বিকাশকে চুপ করাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নানা সান্ত্বনা দেয়।

এর মধ্যে প্লেন ঢাকার আকাশে ঘুরপাক্‌ খেতে শুরু করেছে। এবার প্লেন ল্যাণ্ড করবে।

সমস্ত যাত্রী রুদ্ধশ্বাসে বসে। সকলেই ভীষণ আশঙ্কার মধ্যে—প্লেন রানওয়ে ছোঁয়া মাত্রই যেন কিছু অঘটন ঘটে না যায়!

প্লেন ল্যাণ্ড করে ভালোভাবেই।

হাইজ্যাকারটির চোখ দু'টো সঙ্গে সঙ্গে দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে। এয়ারপোর্টটার চারপাশ একবার ভাল করে দেখে নেয়। যাত্রীরাও উদ্ধারের আশায় ব্যাকুল দৃষ্টিতে বাইরে তাকায়।

প্লেনটি ততক্ষণে সশস্ত্র জওয়ানরা ঘিরে ফেলেছে। একটুপরেই এয়ারপোর্ট থেকে প্লেনের মধ্যে হাইজ্যাকারটির সাথে যোগাযোগ করা হল—হ্যালো, প্লীজ যোগাযোগ করুন হাইজ্যাকার! ওপাশ থেকে জোর উৎকণ্ঠা।

—হ্যালো! হাইজ্যাকারটি যোগাযোগ করে।

—আপনি কে?

—হাইজ্যাকার, ব্রিটিশ। নাম ফিলিপ জনসন।

—প্লেনটি কেন হাইজ্যাক করেছেন?

—ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে দশহাজার ডলার চাই।

—আমরা ব্রিটিশ সরকারকে এক্ষুনি জানাচ্ছি। কিন্তু কাইণ্ডলি প্লেনের প্যাসেঞ্জারদের ছেড়ে দিন।

—না, তা হবে না। আগে আমার দাবী মেটানো হোক। দাবী না মেটালে প্লেনসুদ্ধ সকলকে বোম মেরে উড়িয়ে দেব। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দাবী মেটানো চাই। নয় তো···

—কিন্তু প্যাসেঞ্জারদের শুধু শুধু আট্‌কে কী লাভ! ওদের কাইণ্ডলি ছেড়ে দিন।

—নো। নেভার।

- প্লীজ!

—বলছি তো হবে না।

—তবে কাইণ্ডলি ওদের নিরাপত্তার ব্যাপারে একটু যত্নবান হবেন। আপনার দাবীর ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারকে জানানোর ব্যবস্থা করছি। যাত্রীদের জন্য কি খাবার পাঠাবো?

—না। যখন বলব, তখন!

—হ্যালো···হ্যালো···হ্যালো···

হাইজ্যাকারটি আর যোগাযোগ রাখে না। অবান্তর মনে করে। চোখদু'টো সমানে তখনো জ্বলছে।

বিকাশ হাউ-হাউ করে কাঁদছে—তুমি একটুও ভাল না। হাইজ্যাকারটির দিকে তাকিয়ে বলে।

-ভাল না—ভাল না! কাঁদবে না। কান্না আমি ঘেন্না করি।

—তুমি নিষ্ঠুর।

—ভাল!

—তুমি আমায় একটুও ভালবাসো না?

—না!

—কিন্তু আমি যে তোমায় বড় ভালবাসি!

হাইজ্যাকারটি এবার স্থির প্রসন্ন দৃষ্টিতে বিকাশের দিকে তাকায়। একটু হাসে। চোখ দু'টো চিক্‌চিক্‌ করে। তারপর বিকাশের বাবা-মা'র দিকে তাকিয়ে বলে—আপনারা আপনাদের ছেলেকে নিয়ে এখুনি প্লেন থেকে নেমে যান। আপনারা মুক্ত।

ভগবান যেন তাদের ডাক শুনেছে! খুশীতে ঝলমলিয়ে ওঠে ওদের মুখ। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া কম ভাগ্যের কথা!

বিকাশকে নিয়ে ওর বাবা-মা প্লেন থেকে নেমে আসে। ওরা এগোতে থাকে এয়ারপোর্টের দিকে। বিকাশ তার ব্যাগটার ভিতরে একবার তাকায়। এ কী তার বলটা, খেলনা পিস্তলটা কোথায়? নিরাপত্তা-বাহিনীর লোকেরা ততক্ষণে তাদের কাছে এসেছে। বিকাশ জোরে জোরে জানায়—হাইজ্যাকারটি আমার খেলনা পিস্তল, বল চুরি করে নিয়েছে। ওর হাতে ওটা সত্যিকারের বোম, পিস্তল নয়।

বলতে বলতে বিকাশ ছোটে আবার প্লেনের দিকে।

সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরাও ছোটে পিছু পিছু।
হাইজ্যাকারটি ততক্ষণে একদম কাবু হয়ে গেছে। প্যাসেঞ্জার আর নিরাপত্তা-বাহিনীর লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলে তাকে।
হাইজ্যাকারটি স্বীকার করে সব—এয়ারপোর্টে বিকাশের খেলনা পিস্তল আর ক্রিকেট বল দেখেই তার প্লেন হাইজ্যাক্ করার প্ল্যান মাথায় আসে। একসময় সবার আড়ালে খেলনা পিস্তল আর বলটা নিয়েও নেয়। তারপর···
হাইজ্যাকারটি বিকাশের সেই দু'টো ফিরিয়ে দেয়।

[১০ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

কিষণ সে ডাক শুনতে পেল না। সে কোমর থেকে বাঁশীটা বার করে বাজাতে শুরু করলো।
আমি তাড়াতাড়ি নিচে এসে চৌকিদারকে বললুম, তুমি জানো না, কিষণ বাইরে বেরিয়ে গেছে!
চৌকিদার বললো, আবার বাইরে গেছে। এ ছেলেটাকে কিছুতেই আটকে রাখা যায় না। কী বলবো আপনাকে বাবুসাব, এ ছেলেটার একটুও ভয়-ডর নেই। আটকে রাখলেও ঠিক পালাবে!
আমরা দরজা একটু ফাঁক করে দেখলুম, কিষণ আর বাগানের মধ্যে নেই। সে বাইরের খাদের দিকে চলে গেছে। সেখান থেকে তার বাঁশীর মিষ্টি আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।
আমি চৌকিদারকে বললুম, লোকজন ডাকো। ওকে ফিরিয়ে আনতে হবে তো!
চৌকিদার বললো, কোনো লাভ নেই বাবু! এখন কোনো লোক আর বাইরে যেতে চাইবে না। বাঘটার ডাক শুনে বুঝলেন না। ও খুব ক্ষুধার্ত! সামনে যাকে পাবে তাকেই মারবে!
আমি আঁতকে উঠে বললুম। কিন্তু কিষণ যে বাইরে গেল!
চৌকিদার বললো, ওর কিছু হয় না। এ বড় তাজ্জব ব্যাপার। আপনি এ তল্লাটের যে-কোনো মানুষকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, সবাই জানে। ওর বাঁশীতে যে কী জাদু আছে, ও বাঁশী বাজালে আর বাঘ ওকে ছোঁয় না। একবার কী হয়েছিল শুনবেন?
আমি বললুম, কী?
চৌকিদার বললো, এই তিন-চার মাস আগের কথা। সে রাতেও এই রকম বাঘ বেরিয়েছে, আর ঐ কিষণ দরজা খুলে পালিয়েছে। সেদিন আমার খুব জ্বর, আমি একেবারে বেহুঁস হয়ে পড়েছিলুম। অন্য লোকজনরা পরে সব বলেছে আমাকে। তারা দূর থেকে দেখেছে যে কিষণের একেবারে সামনে এসে পড়লো বাঘটা। ওকে কামড়ালো না, মাটিতে বসে পড়ে বাঁশী শুনতে লাগলো। তারপর কিষণ বাঘের পিঠে চেপে জঙ্গলের দিকে চলে গেল।
আমি বললুম, যাঃ! তা কখনো হতে পারে?
চৌকিদার বললো, আপনি কাল সকালে বাজারে অন্য লোকদের জিজ্ঞেস করে দেখবেন!
কিষণ বাঘের পিঠে চেপেছিল একথা আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারলুম না। কিন্তু বাইরে অনেকক্ষণ কিষণের বাঁশীর শব্দ শুনতে পেলুম। বাঘের গর্জন আর শোনা গেল না একবারও।
অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইলুম আমরা। এক সময় কিষণ ফিরে এলো।
আমরা সবাই জিজ্ঞেস করলুম, কি রে কিষণ, তুই বাঘটাকে দেখতে পেয়েছিলি? বাঘটা তোকে কিছু বললো না?
কিষণ কোনো উত্তর না দিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগলো।

—০—

মহাকাশে বিপদ সংকেত
চিত্র কথা শিল্পী
অমিতাভ সেন
সর্বকনিষ্ঠ মহাকাশচর রাসেল টাউবকে মহাকাশে পাঠান হয়েছে....
কোনও সাড়া পাচ্ছি না আক্রমণের জন্য তৈরী হও!
শত্রুযানের গতিপথ বদলাতে হবে তৈরী হও
ওরানের আকাশে অজানা শত্রু
আকর্ষণ করে শত্রুযানের গতিপথ বদলে দাও
শত্রুযানটা মরুভূমির কোথাও নামিয়ে দাও!
শত্রুযানটা মরুভূমিতে আছড়ে পড়ল!
ওটা আমাদেরটা থেকে অনেক বড়ো
চারিদিক থেকে ঘিরে ধর....
আকর্ষক-রশ্মি দিয়ে ওটা আটকাও
সেনাধ্যক্ষের নির্দেশ - তুমি একাই শত্রুযানে প্রবেশ কর
বর্তিনমধ্যে সজ্জিত হয়ে রাস এগিয়ে গেল...
সৌরমণ্ডলের শেষ প্রান্তে পৃথিবীর উপনিবেশ আকাশে অজানা মহাকাশযানের উপস্থিতি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে - - - - -!
শত্রুযানের পিছনটা ফাঁপা, ছেঁদা করে ভিতরে ঢুকছি...
অদ্ভুত! শত্রুযানের মধ্যস্থলে জীবন্ত কিছু আছে
সত্যই - স্পন্দন পাচ্ছি ...! অদ্ভুত লাগছে!

বাস শত্রুযানের প্রায় মধ্যস্থলে পৌঁছেছে তাকে বাধা দিতে কেউ আসেনি — কিন্তু জীবনের স্পন্দন অনুভব করছি....
এই যন্ত্র বলছে — এই দরজার পিছনে কোনও প্রাণী আছে..
দরজা ভাঙতে হল না — আপনা থেকেই খুলে গেল
অদ্ভুত দেখতে জীব বাসকে স্বাগত জানায়
আরাম কেদারায় অর্ধশায়িত, মুখে কোন কথা নেই।
অপরিচিতের বক্তব্য বাসের মস্তিষ্কে কোষে সাড়া জাগায়...
অপরিচিত বলছে আমার মৃত্যু হবে এখনই
তেরানের অধিবাসি হেলমেট খুলে
বাস বলে — আমি ঋদ্ধ — খবরটা হাই কমাণ্ডকে দেবার কথা — সময় নেই বলছো?
বাসের মস্তিষ্কে নানা তথ্য এসে জড়ো হচ্ছে
বাস ভাবছি — আমার মস্তিষ্ক এখন...— কম্পিউটারের মতন কাজ করছে
বাস যে বিশেষ পোশাকে সজ্জিত হয়ে শত্রুযানে ঢুকেছে তার সংলগ্ন ক্যামেরা শত্রুযানের ভিতরের সমস্ত ছবি সেনানিবন্দদের কাছে পাঠাচ্ছে

মহাকাশযানে অজানা আরোহী !

মহাকাশে দস্যুদের আক্রমণ..... !

[চলবে]

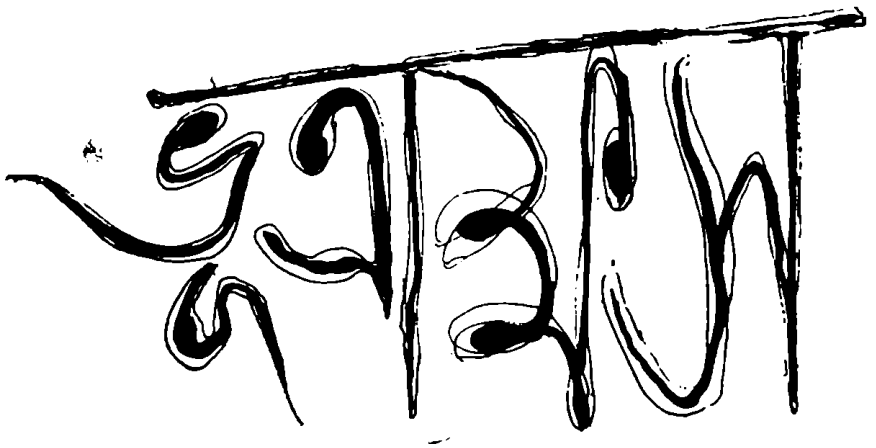

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

কিরিবুরু পাহাড়ী উপত্যকায় একসময় ঘনজঙ্গল ছিল। সেই জঙ্গলে শিকার করার জন্য রামগড়ের রাজা একটা টিলার মাথায় 'হান্টিং লজ' বা শিকার ভবন তৈরি করেছিলেন। মাঝে-মাঝে শিকারে গিয়ে সেখানে তিনি থাকতেন। বাড়িটা কাঠের এবং ওপরে টালির চাল। তার লাগোয়া একটা উঁচু মঞ্চও তৈরি করেছিলেন। মঞ্চে উঠে দূরবীনে চোখ রেখে জন্তুজানোয়ার দেখতেন।

গতবছর কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের সঙ্গে কিরিবুরু গিয়ে দেখি, কোথায় জঙ্গল? সারা উপত্যকা জুড়ে চাষবাস হয়েছে। চারদিকে পাহাড়গুলো পর্যন্ত ন্যাড়া হয়ে গেছে। এখানে-ওখানে আদিবাসীদের কয়েকটা ছোট্ট বসতি ছড়িয়ে রয়েছে। উপত্যকা দুভাগ করে যে নদীটা বয়ে যাচ্ছে, তার ওধারে টিলার মাথায় রামগড়ের রাজার হান্টিং লজ আর মঞ্চটা অবশ্য আছে। কিন্তু দেখলে মনে হবে যেন হানাবাড়ি।

নদীর এপারে সেচ দফতরের ডাকবাংলোয় আমরা উঠলুম আগের ব্যবস্থামতো। তারপর চারদিক দেখে নিয়ে কর্নেলকে বললুম, 'এ কোথায় এলুম আমরা? জঙ্গলের টিকিটিও তো দেখা যাচ্ছে না। মিছিমিছি রাইফেল বয়ে এনেই বা কী লাভ হল?'

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, 'একটু ধৈর্য ধরো জয়ন্ত। তোমার রাইফেলের শক্তি পরীক্ষার সুযোগ অবশ্যই পাবে।'

সেচ দফতরের জিপে আমরা এসেছি। জিপের ড্রাইভারের নাম বদ্রীপ্রসাদ। সে লাল কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল আর বাংলোর চৌকিদারের সঙ্গে কথা বলছিল। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, কর্নিল সাব! 'কর্নিল সাহাব! তুরন্ত্ আইয়ে, ঢুণ্ডু নিক্‌লা!'

কর্নেল তখুনি বেরিয়ে গেলেন। আমি কিছু বুঝতে না পেরে হতচকিতভাবে ওকে অনুসরণ করলুম। এপ্রিলের বিকেল পড়ে এসেছে। ফিকে লালচে রোদ্দুর ছড়িয়ে আছে চারদিকে। কর্নেল চোখে বাইনোকুলার রেখে নদীর উপরে কিছু দেখতে থাকলেন। বদ্রীপ্রসাদ এবং চৌকিদারের মুখ উত্তেজনায় থমথমে। তারাও

ওদিকে তাকিয়ে আছে। আমি কিন্তু কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছিনা। তারপরই শুনলুম নদীর এপারে-ওপারে ছোট্ট বসতিগুলো থেকে হইহই করে লোকেরা বেরুচ্ছে। ঢোল আর ক্যানাস্তারা পেটাতে পেটাতে তারা শোরগোল তুলেছে। কিন্তু কাউকে বসতি ছেড়ে নড়তে দেখছিনা। মনে হচ্ছে, ওরা কোন সাংঘাতিক জন্তু দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

একটু পরে সব উত্তেজনা থিতিয়ে গেল। কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন, 'হুম! কিছু বোঝা যাচ্ছে না।'

জিগ্যেস করলুম, 'ব্যাপারটা কী?'

কর্নেল একটু হাসলেন। তারপর শাদা দাড়ি থেকে একটা শুকনো পাতা ফেলে দিয়ে বললেন 'শুনলে না? ঢুণ্ডু বেরিয়েছিল।'

'ঢুণ্ডু! সে আবার কী?'

'হয়তো কোনো জন্তু—কিম্বা জন্তু নয়।'

'তার মানে?'

কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন, 'এদের ভাষায় ঢুণ্ডুর মানে হল ভূত-রাক্ষস। সন্ধি করে তুমি ভূত্রাক্ষস বলতেও পারো।'

অবাক হয়ে বললুম, 'ভূত আবার রাক্ষস হয় কী করে? রাক্ষসই বা ভূত হয় কী ভাবে?'

কর্নেল বাংলোয় ঢুকে তাঁর অত্যদ্ভুত সেই ক্যামেরা নিয়ে এলেন। এই ইলেকট্রনিক ক্যামেরা অন্ধকারেও ছবি তুলতে ওস্তাদ। তারপর বললেন, 'রাক্ষস মানুষ খায় এবং ভূতের ক্ষমতা কিংবা স্বভাব চরিত্র তো তুমি বিলক্ষণ জানো। ঢুণ্ডুর দুরকম ব্যাপারই আছে। কিরিবুরু উপত্যকা থেকে গত তিনমাসে সাতজন লোক নিখোঁজ হয়ে গেছে। তাদের প্রত্যেকের কংকাল খুঁজে পাওয়া গেছে নদীর চড়ায়। আশ্চর্য ব্যাপার, কংকালে একবিন্দু মাংস নেই—ঢুণ্ডু মাংস চেটেপুটে সাফ করে ফেলেছে। শুধু হাড়গুলো নিখুঁত রয়েছে।'

এতক্ষণে বুঝলুম, আমার ধুরন্ধর বৃদ্ধ বন্ধু কেন কিরিবুরু উপত্যকায় এসেছেন। এ তো দস্তুর মতো অ্যাডভেঞ্চার। আমার গা শিউরে উঠল অজানা আতংকে। বললুম, 'একটু আগে ঢুণ্ডুকে কি সত্যি দেখলেন আপনি?'

'এক পলকের জন্যে দেখলুম।' কর্নেল গম্ভীরভাবে বললেন। 'রাজাবাহাদুরের হান্টিংলজের নিচে একটা লোক ঘাস কাটছিল। তার দিকেই লক্ষ্য ছিল ওর। লোকটা কীভাবে টের পেয়ে পালিয়ে আসছিল চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে। আমি দেখলুম কাঠের বাড়িটার কাছে একটা পাথরের আড়ালে কালো কি একটা অদৃশ্য হল। মানুষের মতো দেখতে কতকটা। যাই হোক, ডার্লিং, এবার তোমার রাইফেলের শক্তি পরীক্ষা হবে। চলে এস।'...

টিলাটা ঘন ঘাসে ও ঝোপঝাড়ে ঢাকা। তার মধ্যে ছোট বড় নানা সাইজের পাথর মাথা উঁচিয়ে রয়েছে। হান্টিং লজের অবস্থা জরাজীর্ণ। তবে দরজায় মরচে ধরা তালা ঝুলছে। সূর্য পাহাড়ের নিচে চলে গেছে। ধূসর আলোয় নিচের সবুজ শস্যে ঢাকা উপত্যকা যেন উত্তেজনায় শিউরে উঠছে মনে হচ্ছিল। কর্নেল কাঠের মঞ্চের পেছনে একটা গাছের ডালে ক্যামেরাটাকে যতক্ষণ মজবুত করে বেঁধে আটকে দিলেন, ততক্ষণ আমি গুলিভরা রাইফেল তাক করে চারদিকে সতর্ক নজর রাখলুম। ক্যামেরার সাটার থেকে একটা কালো সুতো টেনে এনে কর্নেল সামনে ঘাসভরা মাটির ওপর টানটান করে অন্যপাশে একটা ঝোপের গোড়ায় আটকে দিলেন। এই সুতোয় যার পা লাগবে, তার

অজান্তে ক্যামেরায় তারই ছবি উঠবে।

এর পর আমরা লজের বারান্দায় উঠলুম। কর্নেল টর্চ আর রিভলবার বের করে দরজার তালায় টান দিতেই খুলে গেল। কর্নেল বললেন, 'আশ্চর্য তো, তালাটা যেন খোলাই ছিল।'

জংধরা দরজা ঠেলতে বিশ্রি ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে খুলে গেল। ভেতরে টর্চের আলো ফেলে দেখা গেল, একধারে শুধু একটা লোহার খাট ছাড়া আর কিছুই নেই। মেঝেয় ধুলো জমেছে। পেছনে একটা জানলা খোলা এবং গরাদ ভেঙে রয়েছে।

নিশ্চয় চোরের কীর্তি। আসবাবপত্র বা অন্যান্য জিনিস কবে চুরি করে নিয়ে গেছে।

দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে কর্নেল চাপা গলায় বললেন, 'ডার্লিং! আজ রাতে এটাই আমাদের আস্তানা। কিটব্যাগে কিছু শুকনো খাবার আছে। আর এই ফ্লাস্কে কফি আছে। হুম্! রোসো। মোমবাতিগুলো বের করি।'

এই হানাবাড়িতে রাত কাটানোর কথা শুনে আমার বুক কেঁপে উঠল। কর্নেল একটা মোম জ্বেলে লোহার খাটের কোনায় বসিয়ে দিলেন। ঘরের ভেতর কেমন একটা চিমসে গন্ধ। তার মধ্যে কফি খেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু কর্নেলের তাগিদে খেতেই হল। উনি চুরুট ধরিয়ে খোলা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমি মোমের আলোয় ঘরের ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলুম।

পাশের ঘরের দরজাটা ভেঙে পড়েছে। টর্চ জ্বেলে উঁকি মেরে দেখলুল, মেঝে জুড়ে ইঁদুরের গর্ত। কাঁকুরে মাটির স্তূপ। একখানে সাপের খোলস দেখে চমকে উঠলুম। সর্বনাশ! সাপ বেরিয়ে যদি এ ঘরে হানা দেয়?

কর্নেল আমার কাছে এসে উঁকি মেরে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'হুম! সাপের আড্ডা মনে হচ্ছে। তবে আমাদের পায়ে হান্টিং বুট আছে। একটু লক্ষ্য রাখতে হবে।' বলে আর একটা মোম জ্বেলে এনে এঘরের দরজার মাঝামাঝি রাখলেন। 'ব্যস্! আর চিন্তার কারণ নেই। সাপ এই আলো পেরিয়ে এ ঘরে ঢুকবে না। কারণ আলোর সামনে সাপ নিজেকে অসহায় বোধ করে। বড় জোর ফণা তুলে আলোকে হিস হিস শব্দে ধমক দেবে।'

আমরা লোহার খাটে বসে পড়লুম। বাইরে এতক্ষণে একটা জোরালো বাতাস বইতে শুরু করেছে। কাঠের বাড়িটা অদ্ভুত শব্দ করছে। বারবার চমকে উঠছি। একবার খোলা জানালা, একবার মেঝের দিকে, আর একবার পাশের ঘরের দরজায় জ্বলন্ত মোমের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকাচ্ছি। কর্নেলের সঙ্গে অনেক ভয়ংকর রাত কাটিয়েছি, কিন্তু এমন সাংঘাতিক রাত কখনও বুঝি কাটাইনি। কিছুক্ষণ পরে বাইরে হলুদ আভা দেখে বুঝতে পারলুম জ্যোৎস্না ফুটেছে।···

কাঠের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছি, হুপায়ের ফাঁকে রাইফেল—একটু তন্দ্রামতো এসেছিল, কর্নেলের চিমটি খেয়ে সোজা হয়ে বসলুম। কর্নেল ইশারায় বাইরের দরজার দিকে তাকাতে বললেন। তাকিয়ে দেখি, দরজাটা একটু একটু কাঁপছে। কেউ যেন নিঃশব্দে চাপ দিচ্ছে।

আমার পিলে চমকে উঠল তাই দেখে। নির্ঘাৎ সেই আজব ভূত্রাক্ষস ঢুণ্ডু ব্যাটাচ্ছেলে! রাইফেল বাগিয়ে ধরলুম। কর্নেল একহাতে টর্চ, অন্যহাতে রিভলবার নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

দরজায় চাপটা বাড়ছে ক্রমশ। মচমচ করছে জীর্ণ কাঠের কপাট। এবার আমিও উঠে দাঁড়ালুম। দরজাটা আমাদের ফুট দশেক দূরে। হঠাৎ কপাট দড়াম করে ভেঙে পড়ল। পরমুহূর্তে টর্চের আলোয় দেখলুম···

কিন্তু ওকি মানুষ, না ভয়ংকর জন্তু? শরীরের গড়ন অবিকল মানুষের। কিন্তু একটুও লোম নেই—মাথাটাও ন্যাড়া। কালচে রঙের ভৌতিক প্রাণী যেন। তার নাক মুখ-চোখ সবই মানুষের। কিন্তু চোখদুটো জ্বলন্ত নীল টুনি বাল্ব যেন। তার মুখ থেকে অদ্ভুত চাপা একটা গরগর আওয়াজ বেরুচ্ছে, তাও শুনলুম।

মাত্র কয়েকটা সেকেণ্ড। আমি রাইফেলের

ট্রিগারে চাপ দিলুম। প্রচণ্ড গর্জন করে গুলি বেরুল। অটোমেটিক রাইফেল। ছটা গুলি শেষ করে ফেললুম। তারপর দেখি, আজব প্রাণীটি অদৃশ্য। কর্নেল দরজায় উঁকি মেরে টর্চের আলো ফেলে বললেন, 'পালিয়েছে! যাক্ গে, আপাতত আমাদের কাজ শেষ। চলো, বাংলোয় ফেরা যাক্। ঢুণ্ডুবাবাজীকে স্বচক্ষে দর্শনের ইচ্ছা ছিল। দেখলুম. আবার কী?'

সকালে ঘুম ভেঙে দেখি, কর্নেল অভ্যাসমতো প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন এখন টেবিলে ওঁর ছোট্ট ট্রেতে কয়েকটা ভেজা ফোটো। সদ্য প্রিণ্ট করেছেন। আমাকে উঠতে দেখে বললেন, ঢুণ্ডুবাবাজীকে দেখে যাও ডার্লিং! আমাদের চোখ অনেক সময় ভুল করে। কিন্তু ক্যামেরার চোখ নির্ভুল।

ছবিগুলো দেখে বললুম, 'রাতে যাকে দেখেছি, সেই বটে।'

'কোনো তফাত চোখে ঠেকছে না?'

'না তো'।

'ভালো করে দেখে বলো, জয়ন্ত।' বলে কর্নেল আরেকটা ছবি দিলেন।

দেখে বললুম, টাওয়ারের পাশে একটা পাথরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে একটা উলঙ্গ পাগল—মাথাটা ন্যাড়া। ···হুঁ, পাথরের গায়ে কালোমতো একটা কী চিহ্ন।'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়ে আমরা বেরুব। রেডি হয়ে নাও।'

ঘণ্টাখানেক পরে দিনের উজ্জ্বল আলোয় আমরা হাল্টিং লজে পৌঁছলুম। রাতের সেই আতঙ্ক আর টের পাচ্ছি না। টাওয়ারের কাছে খুঁজে খুঁজে সেই পাথরটা আবিষ্কার করলেন কর্নেল। তারপর দেখি, পাথরটার মাথায় কালো গোলাকার একটা ইঞ্চিখানেক উঁচু কী একটা জিনিস। কর্নেল সেটা নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ পাথরটা নড়ে উঠল একটু কাত হয়ে গেল। অবাক হয়ে দেখলুম, হাত চারেক চওড়া একটা কুয়োর মতো সুড়ঙ্গ ধাপে ধাপে নেমে গেছে।

একমুহূর্ত ইতস্তত করে কর্নেল বললেন, 'এস জয়ন্ত, ঢুণ্ডুর ডেরায় ঢুকি।'

কর্নেল সবে প্রথম ধাপে পা রেখেছেন, হাতে টর্চ—কারণ ভেতরটা অন্ধকার বলে মনে হচ্ছে, আচমকা ভেতরে চাপা গরগর শব্দ শোনা গেল। তারপর বিদ্যুৎবেগে সেই ঢুণ্ডুর আবির্ভাব ঘটল এবং কর্নেলের গলা দুহাতে চেপে ধরল। কর্নেল জড়ানো গলায় বলে উঠলেন, 'মাথা! মাথা!'

কর্নেলকে নিয়ে ঢুণ্ডু তখন সিঁড়ির ধাপে পড়েছে এবং ধস্তাধস্তি শুরু হয়েছে। 'মাথা' বলতে কী বোঝাচ্ছেন কর্নেল, বুঝতে দেরি হল একটু। তারপর লক্ষ্য করলুম কর্নেল একটা হাত বাড়িয়ে ঢুণ্ডুর মাথা ধরার চেষ্টা করছেন। আমি রাইফেল বাগিয়ে ধরতে দেরি করিনি। কিন্তু গুলি করে লাভ নেই, তা দেখেছি। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে রাইফেলের বাঁট দিয়ে ঢুণ্ডু ব্যাটার মাথায় প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলুম।

ঠঙাস্ করে শব্দ হল। ব্যাটার মাথা না লোহার পিণ্ড! ফের ওর মাথার পেছনে এক ঘা দিতেই রাইফেলের বাঁট ভেঙে গেল। কিন্তু সঙ্গেসঙ্গে একটা অদ্ভুত কাণ্ডও ঘটল।

ঢুণ্ডুর মাথাটা ছিটকে গিয়ে দমাস করে নিচে কোথাও পড়ল এবং ধাপে ধাপে ঢঙঢঙ শব্দ করতে করতে পাতালে গড়াতে থাকল। তারপর, দেখলুম, ওটা মাথা নয় আদতে—একটা নিছক হেলমেটের মতো জিনিস। ঢুণ্ডুর মুণ্ডু ঠিকই

[পরের অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়]

জাদু-সম্রাট ওজ এর চিত্রকথা

মাঠের ধারে এক কাঠের বাড়িতে ডরোথি থাকে তার কাকা আর কাকিমার কাছে। ওরাই মানুষ করেছেন তাকে। ডরোথির একমাত্র খেলার সাথী হল তার ছোট্ট কুকুর টোটো।

হঠাৎ একদিন প্রচণ্ড ঝড় এলো—সাইক্লোন। কাকা-কাকিমা মাটির নীচের ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন। ডরোথি টোটোকে নিয়ে আটকা পড়েছে কাঠের বাড়ির ভেতরে।

সাইক্লোন গোটা কাঠের বাড়িটা উপড়ে নিয়েছে। ঝড়ের সঙ্গে বাড়িটা শূন্যে উড়ে চলেছে, হেলছে, দুলছে, ঘুরছে। ভীত ক্লান্ত ডরোথি টোটোকে বুকে জড়িয়ে ধরে মেঝের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

চোখে রোদ লাগতেই ডরোথির ঘুম ভাঙলো—টোটো তার গাল চাটছে। চারিদিক নিস্তব্ধ—ঝড়ের গর্জন থেমে গেছে!

বাড়ির দরজা খুলে ডরোথি বেরিয়ে এলো—সঙ্গে টোটো। অচেনা জায়গা। চারদিকে ফুলের সমারোহ। কোথায় এলো তারা?

মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠে কে বলে উঠলো—স্বাগত জানাই, মুচমুচদের দেশে!

ডরোথি ঘুরে দাঁড়ায়। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, তিনজন পুরুষ একজন মহিলা। সকলেই ডরোথির মতন মাথায় লম্বা। পুরুষদের বয়স হয়েছে। লম্বা সাদা দাড়ি, পরনে নীল রঙের ট্রাউজার। মাথার টুপির ডগাটা ক্রমশঃ ছুঁচলো হয়ে গিয়েছে। টুপির কিনারায় ছোট ছোট ঘণ্টা, ওরা মাথা নাড়লেই ঘণ্টাগুলি টিংটিং করে বাজছে।

মেয়েটির পরনে পা-ঢাকা লম্বা গাউন। পোশাকের গায়ে তারা চিকচিক করছে।

মেয়েটি মাথা নীচু করে, অভিবাদনের ভঙ্গিতে—পূবদেশের শয়তানী ডাইনীকে মেরে ফেলে তুমি ডাইনির দাসত্ব থেকে মুচমুচদের মুক্তি দিয়েছ। তোমার বাড়ি চাপা পড়ে ডাইনি মারা গেছে—কাঠের গুঁড়ির তলা দিয়ে ওর পা দেখা যাচ্ছে।

ডরোথির প্রশ্নে মেয়েটি বলে—না, আমি মুচমুচদের কেউ নই।

আমি উত্তর দিকের সৎ-পরী।

ডাইনির ব্যাপারটা ডরোথি জানতে চায়। উত্তর-পরী বলে, তুমি এখন জাদুসম্রাট 'ওজ'-এর রাজ্যে এসে পড়েছ। এর উত্তর ও দক্ষিণে থাকে দুজন সৎ-পরী—তারা কারুর কোনও অনিষ্ট করে না। পূব আর পশ্চিমে থাকে দুই পাজি—ডাইনি। পূবদিকের ডাইনি তো বাড়ি চাপা পড়ে মরেছে। বাকি শুধু পশ্চিমের বদমায়েস ডাইনিটাই বেঁচে আছে।

ডরোথি এসব শুনতে চায় না। তার মন পড়ে আছে কানসাসের তাদের গ্রামে যেখানে তার কাকা আর কাকিমা রয়েছেন।

সৎ-পরী তার মাথার টুপিটার ছুঁচলো দিকটা নাকের ডগায় রেখে এক-দুই-তিন পর্যন্ত গুনলো। টুপিটা হয়ে গেল একটা শ্লেট। শ্লেটের গায়ে লেখা 'ডরোথিকে এমারেল্ড সিটি,

পান্না নগরে যেতে বলো।' সৎ-পরী বলে—ব্যস, আর চিন্তা নেই। পান্না নগরে থাকেন জাদু-সম্রাট ওজ। তিনি ব্যবস্থা করে দেবেন, কিভাবে তুমি তোমার কাকা-কাকিমার কাছে ফিরতে পারবে। ··· তোমায় হেঁটে যেতে হবে। ওই যে হলদে ইঁট বাঁধানো রাস্তা, ওই রাস্তা ধরে গেলেই জাদু-সম্রাট ওজ-এর রাজধানীতে পৌঁছে যাবে।

সৎ-পরী এবার ডরোথির কপালে চুমু খেল। ডরোথির কপালে উজ্জ্বল গোল একটা দাগ হয়ে গেল—এই দাগ বিপদ আপদ থেকে ডরোথিকে রক্ষা করবে।

মুচমুচরা ছুটে গিয়ে মৃত পূব দেশের ডাইনির পা থেকে জুতো দুটো খুলে এনে ডরোথিকে পরতে বললো।

এদুটো জাদু জুতো কিন্তু এর গুণ এরা কেউই জানত না।

ইঁট বাধানো রাস্তা ধরে ডরোথি

আর টোটো হাঁটছে তো হাঁটছে। অনেকক্ষণ হেঁটে ক্লান্ত হয়ে তারা একটা গমের ক্ষেতের ধারে বসলো বিশ্রাম করতে।

ক্ষেতের মাঝখানে একটা কাগ-তাড়ুয়া, উঁচু একটা লাঠির ডগায় বেঁধে রাখা হয়েছে। ছোট্ট মাথাটা একটা থলির মধ্যে খড় পুরে বানানো হয়েছে, নাক, মুখ, চোখ এঁকে দিয়েছে কারা। পরনে নীল রঙের পাতলুন, পায়ে পুরনো একজোড়া বুট, মাথায় নীল টুপি।

ডরোথি ওদিকে তাকাতেই কাগতাড়ুয়া চোখ পিট্ পিট করে, মাথা নাড়ে। ডরোথি অবাক হয়ে এগিয়ে যায়।

—সুপ্রভাত? বলে কাগতাড়ুয়া।

ডরোথি চমকে ওঠে—তুমি কথা বলছো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। কেমন আছ?

—ভাল আছি। তুমি কেমন আছ?

—ভাল নই। লাঠিটা পিঠে খোঁচা মারছে, নামতে পারছি না। ডরোথি বাঁধন খুলে লাঠি থেকে কাগতাড়ুয়াকে নামিয়ে আনে।..... আঃ বাঁচলুম! ধন্যবাদ!

ডরোথি অবাক! কাগতাড়ুয়া হাঁটে, কথা বলে—এতার অভিজ্ঞাতায় নেই।

কাগতাড়ুয়ার প্রশ্নে ডরোথি বলে, কানসাসে তার কাকা কাকিমার কাছে সে ফিরে যেতে চায়। তাই পান্না নগরে—জাদু সম্রাট ওজ-এর কাছে যাচ্ছে।

কাগতাড়ুয়া দুঃখের সঙ্গে বলে আমার মাথায় শুধু খড় পোরা, মগজ বলে কিছু নেই। জাদু-সম্রাট আমার মাথায় মগজ ঢুকিয়ে দিতে পারবে?—চল দুজনেই যাই। জাদু-সম্রাট একটা ব্যবস্থা হয়তো করতে পারবে।

তারপর টোটোকে সঙ্গে নিয়ে ডরোথি আর কাগতাড়ুয়া হাত ধরাধরি করে ইঁট বাঁধানো রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললো।

ওরা হাঁটছে তো হাঁটছে। খড়ের তৈরী কাগতাড়ুয়ার ক্লান্তি নেই। কিন্তু ডরোথি আর হাঁটতে পারছে না। দিনের আলো নিভে গেল। কাগতাড়ুয়ার অসুবিধা নেই, অন্ধকারেও দিব্যি দেখতে পাচ্ছে। ডরোথি বলে একটা বাড়ি চোখে পড়লেই, সেখানে রাত কাটাবো।

খানিকবাদে একটা কাঠের বাড়ি দেখতে পেয়ে ওরা সেখানে ঢুকে পড়লো। টোটোকে কোলের কাছে নিয়ে ডরোথি শুয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় ঘুম! কাগতাড়ুয়ার চোখে ঘুম নেই। বসে রইলো!

সকাল হ'ল। চোখে রোদ পড়তে ডরোথি উঠে বসে। একটা কাতরানির শব্দ তার কানে আসে—কে যেন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। একটু দূরে ঝোপের মধ্যে কি যেন চক্‌চক্ করছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় ডরোথি। বনের মধ্যে একটা বড় গাছের ধারে দাঁড়িয়ে আছে সম্পূর্ণ টিনের তৈরী একটা 'মানুষ'—তার হাতে একটা কুড়ুল!

—তুমিই কাতরাচ্ছিলে?

—হ্যাঁ কেউই কাছে আসে না। ...যাও মেসিনে তেল দেবার পাত্রটা নিয়ে এসে আমার এই জোড়ের মুখগুলোয় তেল দাও। জঙ ধরে গেছে। হাত পা নাড়তে পারছি না।

ডরোথি ছুটে গিয়ে বাড়ির ভেতর থেকে তেলের পাত্র নিয়ে আসে, তালপাতার-সেপাই যেখানে যেখানে বলে, তেল দেয়। তালপাতা এখন সচ্ছন্দে হাত পা নাড়ছে, চলা ফেরা করছে।

তালপাতা বলে, পূবদিকের বদ-মায়েস ডাইনি তাকে টিনের মানুষ বানিয়ে দিয়ে তার হৃৎপিণ্ডটা নিয়ে চলে গেছে। জাদু-সম্রাট আমার হৃৎপিণ্ড ফিরিয়ে দিতে পারবে?

ডরোথি বলে নিশ্চয় পারবে। চলো আমাদের সঙ্গে পান্না নগরে।

ওরা তিনজন হাত ধরাধরি করে নাচতে নাচতে এগোতে থাকে। টোটো ওদের আগে আগে নাচতে নাচতে দৌড়চ্ছে!

আমাদের বাড়ির সামনে ভালুকনাচ দেখলাম আমরা। পয়সা নিয়ে ভালুকওলা চলে যাচ্ছে। তার এক হাতে ভালুকের গলায় বাঁধা দড়ির একটা দিক, আর সরু একগাছি লাঠি। অন্যহাতে ডুগ্‌ডুগি। হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেটাকে অনবরত বাজাচ্ছে··ডুগ্‌ডুগ···ডুগ্‌ডুগ···ডুগ্‌ডুগ·····।

কাঁধে একটা রঙবেরঙের কাপড়ে সেলাই করা ঝোলা।

দুলকি চালে তার পিছনে পিছনে চলেছে ভালুকটা। সেটার চারটে পায়ে বাঁধা ঘুঙুর চলার ছন্দে বেজে চলেছে···ঝুম্‌ ঝুম্‌ ঝুম্‌···!

আমরা দলবেঁধে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছি। আমাদের গলির মোড়টা ওরা পার হয়ে গেলে আর দেখা যাবে না। যতক্ষণ দেখা যায়, তাকিয়ে থাকা।

গলির মোড়ে ভালুকনাচওলা অদৃশ্য হয়ে যেতেই ঝিম্‌লি বললো, 'কানা ভালুক।'

সঙ্গে সঙ্গে বুকাই প্রতিবাদ করলো, 'কক্ষনো না। দু'চোখ দিয়ে দিব্যি প্যাট্‌ প্যাট্‌ করে তাকাচ্ছিল দেখলাম—'

ঝিম্‌লি বিরক্ত হয়ে বললো, 'যেটা বুঝিস না, তা নিয়ে তর্ক করতে আসিস না। বুঝলি?' বুকাইও

শ্রীধর সেনাপতি

কম যায় না তর্কে। সেও গলায় জোর এনে বললো, 'নাচ দেখাবার সময়ে ভালুকওলা ভালুকের চোখে একবার কালো চশমা পরিয়ে দিয়েছিল বলেই কি তুই ধরে নিয়েছিস, ভালুকটা কানা?'

কুমকুম মাথা নাড়তে লাগলো। শেষে নিল বুকাইয়ের দিক। মিন্‌মিনে গলায় বললো, 'ভালুকওলা যেন বলেছিল কী একটা অসুখের পর থেকে ভালুকটা একটা চোখে ভাল দেখে না। তাই ডাক্তার চশমা পরিয়ে দিয়েছে।'

এব্যাপারটা আমি আগে খেয়াল করিনি। কা'র কথা সমর্থন করবো? তাই চুপ করে থাকি। ওদিকে তিনজনের ভেতরে তর্কবিতর্ক ক্রমশই

বাড়তে থাকে। পাড়ার দু'চারজন ছেলে তাই দেখে মজা পেয়ে হৈ হৈ করতে করতে বলে ওঠে, 'নারদ! নারদ!'

পাশেই আমাদের বাইরের ঘর। রাস্তার দিকের জানলা খোলা। জানলার ধারে আরাম চেয়ারে আধশোয়া হয়ে কী একটা বই পড়ছিল আমাদের চুংকুদা। বাইরের হট্টগোল এতক্ষণে চুংকুদার টনক নাড়ালো। সোজা হয়ে বসে ঘরের ভেতর থেকে ধমকের সুরে বললো, 'এই···এই। কী হচ্ছেটা কী তোদের, অ্যাঁ? চুপ্ কর্।'

বুকাই বললো, 'দেখোনা, চুংকুদা! ঝিম্‌লি আর কুমকুম এত বাজে কথা বলে, না···'

চুংকুদা বললো, 'আমি সব শুনেছি। বুঝেছি। তোমরা সবাই চুপ করো। বলি তর্কটা কিসের? কানা ভালুকের কথা নিয়ে তো? তা' ভালুক কি কানা হতে পারে না? সবাই ঘরের ভেতরে আয়। একটা গল্প বলবো। তোরা এখন যে ভালুকটার নাচ দেখলি, সেটা কানা হলেও অতি নিরীহ! কিন্তু আমি যে গল্পটি বলতে যাচ্ছি···'

গল্প! গল্প! দুদ্দাড় করে দৌড়লাম আমরা তর্কা-তর্কি ভুলে। ঘরে ঢুকে চুংকুদাকে ঘিরে বসলাম। চুংকুদার গল্প শুনবো। উৎসাহ আর আগ্রহ নিয়ে আমরা সবাই যেন টগবগ করে ফুটছি। গল্প শুরু করার আগে চুংকুদা একটা সিগারেট ধরাবার জন্যে যে সামান্য সময়টুকু নিল, সেটাও যেন আমাদের ধৈর্যের ওপরে অত্যাচার বলে মনে হতে লাগলো আমার।

চুংকুদা বললো, 'কিছুদিন আগে দিল্লীতে ভারতের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়েছিল। যে গল্পটি এখন বলতে যাচ্ছি, সেটা তাঁরই জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া।'

অবশেষে শুরু হলো চুংকুদার গল্প বলা:

দিগন্তকে আড়াল করে সামনে পিছনে পাহাড়ের পর পাহাড়ের ঢেউ। বিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের কতক-গুলো বিশাল ঢেউ হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এই পাথরের ঢেউয়ের কোলে কোলে রয়েছে নিশ্ছেদ অরণ্য। পৃথিবীর আদিম যুগ থেকে এই অরণ্য বাঘ ভালুক হাতি গণ্ডার হরিণ ময়ালের মতো প্রাণীদের আবাসভূমি হয়েই রয়ে গেছে। মানুষের এক উপজাতিরও বাস এই অঞ্চলে। প্রতিনিয়ত অরণ্যের হিংস্রতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে হয় তাদের। তাই শিশুকাল থেকেই তারা হয়ে ওঠে দুঃসাহসী, বেপরোয়া। অরণ্যে পশুপাখি শিকার করা তাদের কাছে একটা প্রিয় খেলা হয়ে ওঠে। লংকাম টেরেন্ ওই উপজাতি গোষ্ঠির এক যুবক।

সময়টা এখন আশ্বিনের শেষ দিক। পাহাড়শীর্ষ-গুলো শুভ্র তুষার মুকুট পরে থাকে বছরের সব সময়েই। আর, এখন তো বরফ এখানে সর্বত্রই। তুষারের মোটা কার্পেট যেন সব কিছুকে ঢেকে ফেলতে চায়। নিদারুণ হিমেল হাওয়া গর্জন করে শিস্ দিয়ে প্রবল বেগে বয়ে চলেছে। প্রকৃতির এই চরম হিমশীতল ভ্রূকুটি লংকাম টেরেনকে নিরুৎসাহিত করতে পারেনি। কেউ কেউ বলতে পারে, এমুহূর্তে কোন মানুষের পক্ষে দুঃসাহসিকতা দেখানোর চেষ্টা করাটা স্রেফ্ পাগলামো ছাড়া আর কিছু না। কিন্তু লংকাম টেরেন্ পাগল নয়। বরফের ওপর দিয়ে সে চলেছে পা টেনে টেনে। বন্য বেপরোয়া দৃষ্টি তার দুই চোখে। একবার হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সে সামলে নিল নিজেকে। এক হাতে রাইফেল। অন্য হাতখানা

মাঝে মাঝেই মুখ চোখের ওপর থেকে তুষারকণা মুছে নিতে ব্যস্ত।

চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়সের তরতাজা টগবগে শরীর। তুষার বরফের সঙ্গে বোঝাপড়া করার উপযোগী পোশাকে ঢাকা। পেশাদার শিকারীর সহজ ভঙ্গীতে নাড়াচাড়া করছে তার হাতের রাইফেল। তার সাজসরঞ্জাম একেবারে নতুন। এ অঞ্চলে যে কত রকমে মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে, তেমন ধারণা একটু না নিয়ে এদিকে পা বাড়ানো মহা-মূর্খের কাজ। এ কথা লংকাম টেরেন্-এর অজানা নয়।

অনেকদিন আগে এ অঞ্চলে বাবার সঙ্গে শিকার করতে আসতো সে আর তার ছোট ভাই। শিকারের হাতেখড়ি তাদের বাবার কাছেই হয়। তখন তাদের প্রধান অস্ত্র ছিল বর্শা বল্লম তীরধনুক। অতীতের শিকারের দিনগুলোর স্মৃতি লংকাম টেরেনের কাছে খুব সুখের নয়। তার মন প্রাণী হত্যায় বিশেষ সায় দিত না। শিকারে ঘৃণা হতো। তারপর একটা সরকারী কাজ পেয়ে বাবা যেদিন মা আর তাদের দু'ভাইকে নিয়ে পাহাড়ী গাঁও ছেড়ে শহরে চলে গেল, সেদিন কী অপরিসীম আনন্দই না হয়েছিল লংকাম টেরেন-এর। যাক! অকারণে আর পশুপাখী শিকার করতে হবে না!

কিন্তু ছোট ভাইটির প্রকৃতি ছিল তার উলটো। এই পাহাড়, এই নিবিড় অরণ্য তাকে প্রায় সদাসর্বদা চুম্বকের মতো টানতো। শহুরে সে হতে পারেনি। শহরের বাসা থেকে তাই মাঝে মাঝেই পালিয়ে যেতো নিজেদের গাঁও ঘরে। তার রক্তে ছিল পশুপাখি শিকারের অন্ধ উন্মাদনা। কিশোর বয়স থেকেই দেশীবিদেশী শিকারীদের কাজে সে সাহায্য করতো, সঙ্গ নিত। এভাবেই শিখেছিল সে রাইফেল চালাতে। দাদা লংকাম টেরেন-এর হাতে সে জোর করে রাইফেল গুঁজে দিয়ে বলতো, "দু'পাঁচবার এটা চালিয়ে দেখো,

নেশা ধরে যাবে।" এইভাবে লংকাম টেরেনকে রাইফেল ব্যবহার করতে শিখিয়েছিল তার ছোট ভাই। মাঝে মধ্যে দু'একবার তার সঙ্গে শিকারেও বেরিয়েছে লংকাম টেরেন। রাইফেলের গুলিতে দু'চারটে বন্যপ্রাণী হত্যাও করেছে। ছেলেবেলার মতো তাতে কিন্তু মনের ভেতরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া জাগেনি। শিকারকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া গুলি ব্যর্থ হতে না দেখে বরং আনন্দিত আর রোমাঞ্চিতই হয়েছিল সে। প্রাণী শিকারেও উৎসাহ বাড়িয়ে তুলেছিল।

তারপর গাঁও থেকে এসেছিল সেই মর্মান্তিক শোচনীয় দুঃসংবাদটা। ছোট ভাইটি আর নেই। তার মৃতদেহ জঙ্গলের মধ্যে পাওয়া গেছে। পাশে পড়েছিল রাইফেলটি দুমড়ে ভাঙা অবস্থায়। খবর শুনে লংকাম টেরেন-এর অবস্থা প্রথমে পাগলের মতন। ভাইটির মজবুত শরীর তীক্ষ্ণ নখের আঘাতে নাকি ফালা-ফালা, ক্ষতবিক্ষত হয়ে বরফের মধ্যে পড়েছিল। এসব দেখে স্থানীয় অভিজ্ঞ লোকের নিশ্চিত ধারণা, একচোখো বিশাল আকারের যে ভালুকটিকে মাঝে মধ্যে অরণ্যের এই বিশেষ অঞ্চলে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়, এই শোচনীয় ঘটনার আসামী সেটিই। উত্তর পশ্চিমে নেপালের তরাই অঞ্চল থেকে প্রাণীটা আসা যাওয়া করে থাকে। গাঁওয়ের অনেক মানুষই খবরটা রাখে।

দুঃসংবাদটা কানে আসার পর থেকে লংকাম টেরেন-এর বুকের ভেতর দুঃখে শোকে প্রতিশোধ স্পৃহায় শুধু তোলপাড় করেছে। চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরিয়েছে প্রচণ্ড ক্রোধের অগ্নিশিখা। ভাইয়ের মৃত্যুর বদলা নিতে বেরিয়ে পড়েছে সে, যা জানবার তা সব কিছু জেনেশুনেই।

লম্বা লম্বা গাছের ডালে পাতায় ছোট বড় ঝোপ-ঝাড়ে তুষারের পোশাক। কোথায়? কোথায় রয়েছে সেই শয়তান এক চক্ষু দানব? লংকাম টেরেন-এর দৃষ্টি থেকে গাছগুলো দিগন্তকে আড়াল করে ফেললো। তুষারশীতল হাওয়া সোজাসুজি তার মুখেচোখে নির্মমভাবে সুতীক্ষ্ণ দাঁত বসাতে লাগলো। সমস্ত শরীরের অস্থিমজ্জা পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে ওই আঘাতের নিদারুণ যন্ত্রণা। রাইফেলের গায়ে শক্ত করে চেপে বসালো তার হাত। তার আশা, খুঁজে বেড়ানোর এই যন্ত্রণা হয়তো এখানেই শেষ হবে।

ভালুকটার সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে একটা একটা করে পাঁচ পাঁচটা দিন তাকে কাটিয়ে দিতে হয়েছে এই অরণ্যের বুকে। আবহাওয়া আতঙ্কজনক। ঠাণ্ডায় হঠাৎ জমে যাওয়া যেকোন মানুষের কপালে ঘটে যেতে পারে। তার ওপরে রয়েছে হিংস্র নেকড়ের পাল। ঘিরে ধরে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়া অসম্ভব নয়। এবিপদগুলো লংকাম টেরেন-এর জন্যে দিনের প্রতিটি মুহূর্তের জন্যে রয়েছে। নেকড়ের সংখ্যা অরণ্যের এ অঞ্চলটাতে যেন একটু বেশীই। প্রায়ই লংকাম টেরেন্-এর নজরে আসছে। তাই নিজের জন্যে জুৎসই নিরাপদ একটা আশ্রয়স্থল গোড়াতেই খুঁজে নিয়েছিল। রাতটা সেখানে কাটায়। দু'এক ঘণ্টা ঘুমোতেও পারে। কিছু খাবার আর অতিরিক্ত একটা রাইফেলও সেখানে রয়েছে।

দেওদার শাল শিমুল জারুলে অরণ্যকে এখানে যেন আরও ঘন নিবিড় করে রেখেছে। মহুয়া গাছও অসংখ্য। এপাশে ওপাশে ঘোরাঘুরি করে লংকম টেরেন বুঝে নিল, এদিকটা অরণ্যের শেষ সীমা। তারপর থেকে নেপালের তরাই অঞ্চল শুরু। এদিকটাতে এই প্রথম এলো সে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস তার দ্রুত হয়েছে। চলার গতিতেও যেন এলো একটু অস্থির অসহিষ্ণুতার লক্ষণ। নিঃশ্বাস

ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুস থেকে বেরিয়ে আসা বাষ্পের মেঘ নাকের কাছে দেখা দেবার আগেই হিমেল বাতাস তা ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নিজের স্বাভাবিক অনুভূতি দিয়ে সে বুঝতে শুরু করলো, তার শত্রু ওই একচোখো দানবকে আশে-পাশে কোন এক জায়গাতেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব। মহুয়া খাওয়ার লোভে সেটা ঘুরে বেড়াতে পারে। এখানে জায়গায় জায়গায় উইয়ের ঢিবি। উইও ভালুকদের প্রিয় খাদ্য।

আরও সতর্ক হলো সে। নিজেকে গাছের আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে আরও এগোতে লাগলো প্রায় নিঃশব্দ পদক্ষেপে। বাতাসের শব্দকে ছাপিয়ে আর কোন আওয়াজ কি কানে এসে ধরা দিচ্ছে? দূরে মাঝে মধ্যে হরিণের ডাক। পাখীদের ডানার ঝটপটানি। কাছাকাছি হঠাৎ একটা গাছের ডাল নাড়া খেলো। পাতায় জমা বরফ খসে পড়লো নীচে।

সেদিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো লংকাম্ টেরেন-এর। সে আর পা বাড়াতে পারলো না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো একই জায়গায়। শেষ পর্যন্ত পরস্পরের একেবারে নাগালের মধ্যেই কি পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হয়েছে? তার দেহের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রী টান্ টান্ হয়ে যেন সেতারের মতো ঝঙ্কার দিয়ে বেজে উঠলো।

এখন যে কোন মুহূর্তে গুলি বর্ষণ করার জন্যে প্রস্তুত শিকারীর হাতের রাইফেল।

তারপরই নিজেকে বোকা বোকা মনে করে রাইফেল নামিয়ে ফের সে আগের মতো এগোতে লাগলো। কঠিন পাথর আর বরফের ওপরে তার স্নো-সুর ছপ্ ছপ্ আওয়াজ উঠতে লাগলো অস্পষ্ট ভাবে। তার সজাগ কান ওই গাছে বসে থাকা একটা নিঃসঙ্গ পাখীর করুণকাতর ডাক শুনতে পেল। সে আরও কিছুটা দূরত্ব অতিক্রম করলো। সামনে একটা প্রাণীর কঙ্কাল। হরিণের। নিশ্চয়ই নেকড়ে বাঘের উচ্ছিষ্ট। কথাটা মনে জাগতেই ভয়ে দেহটা শিউরে উঠলো একটু। সত্যি যদি ক্ষুধার্ত নেকড়ের পালের মধ্যে পড়ে যেতে হয়, তাহলে নিজের মৃত্যুকে ঠেকানো যাবে না।

সে তার গতিপথ পরিবর্তন করতে চাইলো। ঘুরে দাঁড়ালো হরিণের কঙ্কালটাকে পিছনে রেখে। আর, তারপরই নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেললো—যন্ত্রণা সামলাতে মানুষ যেমন করে। অপরিসীম ভয়ে তার দেহটা যেন মুহূর্তে হিম হয়ে গেল। সে দেখলো, তার কাছ থেকে মাত্র কয়েক হাত তফাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই এক চক্ষু দানব। পিছনের দু'পায়ে সেটা খাড়া। সামনের পা'দুটো বুকের কাছে হাতের মতো অস্থিরভাবে নড়াচড়া করছে। সুতীক্ষ্ণ বাঁকা হুকের মতো নখ প্রতিটি থাবায়।

স্মৃতি তাকে খোঁচাতে থাকলো নির্দয়ভাবে। এহেন সময়েও ছোটভাইটির মিষ্টি মুখখানা একবার মনের কোণে বিদ্যুতের মতো উঁকি দিয়ে গেল। বাড়িয়ে দিয়ে গেল তার প্রতিশোধ স্পৃহাকে। এখন তার কাছে প্রতিটি মুহূর্ত হিসাবের ছকে বাঁধা। লংকাম টেরেন্ সাহসভরে রাইফেলের লক্ষ্য স্থির করতে লাগলো ভালুকটার দিকে। এমুহূর্তে সে নিজেও তো ওই দানবের লক্ষ্য।

দ্রুত ফায়ার করলো সে। তাড়াতাড়িতে রাইফেলের কুঁদো বুকের কাছে ঠিকভাবে ধরে রাখা হয়নি। লক্ষ্যও সামান্য বেঠিক হয়ে গেল তাই। রাইফেলের কুঁদোর উলটো ধাক্কা কিছুটা বেসামাল করে দিল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার নাগালের বাইরে দিয়ে শূন্যে ঘুরে গেল ভালুকটার একটা সুতীক্ষ্ণ থাবা।

আতঙ্কের ওপরে আতঙ্ক! লংকাম টেরেন বুঝতে

পারলো দানবের অন্য হাতটা তার কোমর জড়িয়ে ধরেছে। সে ফের রাইফেল তুলে ধরলো। কিন্তু লক্ষ্য ঠিক রেখে গুলি করার সুযোগ নেই। তাই রাইফেলের কুঁদো দিয়ে অন্ধভাবে সে আঘাত করলো ভালুকটার চোয়াল লক্ষ্য করে। আঘাত পেয়ে মাত্র দু'একপা পিছু হঠলো সেটা। থাবাটা খসে গেল লংকাম টেরেন-এর কোমর থেকে।

অতঃপর লংকাম টেরেন-এর হাতের রাইফেল লাঠির মতো এলোপাথাড়িভাবে ভালুকটার মুখে মাথায় সজোরে আঘাত করতে লাগলো। যেকোন মানুষকে এভাবে আঘাত করে খতম করা যায়। কিন্তু পশুদানবটা মাথা নেড়ে নেড়ে আঘাতের প্রচণ্ডতা যেন ধূলোবালির মতো ঝেড়ে ফেলতে লাগলো সেটার দেহ থেকে। আর, সাঁড়াশির মতো দুটো থাবা বাড়িয়ে রাইফেলটিকে শিকারীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করলো বারবার।

ছোট ভাইটি নিশ্চয়ই এভাবেই প্রাণ হারিয়েছিল। কথাটা লংকাম টেরেন্-এর মনের মধ্যে বিদ্যুতের মতো চম্‌কে গেল। তার মৃতদেহের পাশে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল শিকারের রাইফেলটিকে দুমড়েভাঙা অবস্থায়।

রাইফেলটাকে কোনক্রমে ফের ঘুরিয়ে নিল সে। ট্রিগারে চেপে বসলো তার হাতের আঙুল। গুলির আওয়াজ চারপাশের অরণ্য জুড়ে প্রতিধ্বনি জাগালো। ভালুকটা এখনও তার কাছে দাঁড়িয়ে। আগের মতোই অক্ষত। সেটার একটিমাত্র চোখ দিয়ে ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের আগুন বর্ষিত হচ্ছে দ্বিগুণ তেজে। তারপর লংকাম টেরেন্ বুঝতেই পারলো না, কোন্ ফাঁকে রাইফেলটা তার হাতছাড়া হয়ে গেল। অগত্যা অসহায়ভাবে সে তার কোমরে গোঁজা ছুরির দিকে এবার হাত বাড়ালো।

এই অবসরে রাইফেলটাকে দুমড়ে ভেঙে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিল ভালুকটা। এবং বিস্ময়কর তৎপরতার সঙ্গে ফের এগিয়ে এলো লংকাম টেরেন্‌কে লক্ষ্য করে।

আসুক এগিয়ে! এবার তাহলে সেটার সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই। লংকাম টেরেন্ আশা করতে লাগলো, দানবটার সামনের দুটো থাবা তাকে জড়িয়ে ধরার মুহূর্তেই ছুরিটাকে লোমশ বুকের ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে পারবেই। সে নিজেও এখন মরিয়া।

লংকাম টেরেন্‌এর মুখখানা ভালুকের লোমের ভেতরে প্রায় ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ছুরি ধরা হাতটাও সেটার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করার জন্য উঠে এল ওপর দিকে। শিকারীর মতলব যেন বুঝতে পেরে শেষ মুহূর্তে ঝাঁকি দিয়ে ভালুকটা একপাশে সরে গেল। ছুরির লম্বা ফলা লোমের ফাঁক দিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ভালুকের কাঁধের কাছে বিদ্ধ হলো। পিছু হটে গেল আতঙ্কিত শিকারী লংকাম টেরেন্। যাঃ! শেষ সুযোগও এখন বুঝি হাতছাড়া। গভীর আতঙ্কে বুজে গেল তার চোখ দুটি। এবার— যা অনিবার্য তা ঘটে যাক। এক একটা মুহূর্ত কাটে, যেন এক একটা যুগ। কিন্তু নতুন করে ঘটেনা আর কোন কিছু।

কী ব্যাপার? লংকাম টেরেন্ ফের ধীরে ধীরে চোখের পাতা খুললো। অমনি এক অদ্ভুত দৃশ্য নজরে ধরা দিল তার।

ঘাড়ের কাছে বিদ্ধ হয়ে থাকা ছুরিটাকে তুলে ফেলে দেবার জন্যে ভালুক নানান্ ভঙ্গীতে চেষ্টা করছে। লাফাচ্ছে। শুয়ে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে। ডিগবাজি খাচ্ছে। সামনের পা দুটো তুলে দিচ্ছে ঘাড়ের ওপরে। ওই সঙ্গে রয়েছে নিশ্চয়ই

দৈহিক যন্ত্রণারও অভিব্যক্তি। তাজা রক্তে ভিজে ঘাড়ের লোম চাপ বেঁধে গেছে।

বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও লংকাম টেরেন্ এটাকে নিজের সৌভাগ্য বলে মনে করলো। এখনও পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় সে বেঁচে রয়েছে। এটা কি অলীক স্বপ্ন? কতক্ষণ স্থায়ী হবে?

আহত ভালুকটির যন্ত্রণাকাতর ভাঙা কর্কশ স্বর অরণ্য ভূমিতে প্রতিধ্বনি জাগাতে লাগলো মাঝে মাঝেই। ছুরিটা হয়তো সেটার ঘাড় থেকে খসে পড়তে আর বেশী সময় নেবে না। অথবা যন্ত্রণাটার সঙ্গে একটু করে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে দানবটা। আহত ক্রুদ্ধ দানব শেষ পর্যন্ত মরণ চিৎকারে অরণ্যভূমি কাঁপিয়ে তার শত্রুকে নিধন করতে টলতে টলতে দৌড়ে আসবেই এক সময়।

সাবধান হওয়ার মতো সময় আর কত আছে লংকাম টেরেনএর হাতে! সে আশা করতে লাগলো, ইতিমধ্যেই নিজের গুহাটির ভেতরে গিয়ে অন্ততঃ ঢুকতে পারবে। সেখানে তার আর একটা রাইফেল আছে। ছুরি আছে। টর্চ আছে। রয়েছে শুক্‌নো খাবারও। আশ্রয়টাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলা যায়। তবে প্রায় মাইল দুই দূরে রয়েছে ওই গুহা। পাহাড় অরণ্য ঘিরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে একটু একটু করে নেমে আসছে আদিম অন্ধকার। অরণ্য আরও হিংস্র, আরও ভয়াল ভয়ঙ্কর হয়ে জেগে উঠবে। তার আগেই গুহাতে পৌঁছনো দরকার।

লংকাম টেরেন্ তার আশ্রয় ঘাঁটির দিকে দৌড়ে চললো।

বুকে প্রচণ্ড হাঁফ ধরেছে। সে এসে পৌঁছালো একটা খোলা জায়গায়। মাথার ওপরে মেঘের রঙ কালো হয়ে যাচ্ছে। চারপাশের চোখ ধাঁধানো তুষার শুভ্রতায় খেলা করছে এক অদ্ভুত আলো। গুহায় ফেরার পথ চিনে নেবার পক্ষে এ আলো লংকাম টেরেন-এর কাছে যথেষ্ট।

যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে গুহার দিক লক্ষ্য করে এগোতে থাকলো সে। সময় চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনের নিরাপত্তা সম্পর্কে তার মনে তিল তিল করে হতাশার চাপও জমাট বাঁধতে শুরু করেছিল। কিন্তু কয়েক মিনিট বাদে সেই বাষ্প মিলিয়ে গেল। জীবনের আশায় ফের উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো সে। পিছন ফিরে সে দেখলো। না! আহত ক্ষিপ্ত এক চক্ষু দানবটা তাকে অনুসরণ করে আসছে না!

কিন্তু আশা এক জিনিস! বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা আর-এক জিনিস! দানবটা হয়তো নিজেকে সামলে নিয়ে এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো পিছন থেকে দৌড়ে আসতেও পারে। সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পথটুকু অতিক্রম করতে লংকাম টেরেন-এর যে সময় লেগেছে তার চেয়ে হয়তো কম সময় লাগবে ভালুকটার। যাই হোক, গুহায় পৌঁছে একবার আশ্রয় নিতে পারলেই ফের রাইফেল থেকে সে ভালুকটিকে লক্ষ্য করে যে গুলি ছুঁড়বে, লংকাম টেরেন্ আশা করলো, গুলিটি আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।

কিন্তু ও কী! লংকাম টেরেন-এর আপাদমস্তক শিউরে উঠলো নিদারুণ আতঙ্কে। সে দেখলো, এখন দূর থেকে সাদা বরফের ওপর দিয়ে একপাল কালো কালো জন্তুর মিছিল দ্রুতবেগে ধেয়ে আসছে তার দিক লক্ষ্য করে।

জন্তুগুলোকে চিনতে তার ভুল হলো না। নেকড়ের পাল!

এ এক নতুন বিপদ। তার চোখ দুটো পাগলের মতো বিপদের সময়ের আশ্রয় খুঁজতে লাগলো। নেই! নেই! সামনে পিছনে এপাশে ওপাশে

তুষার বরফে ঢাকা কিছুটা উন্মুক্ত অঞ্চল। সে আশ্রয় নেবে কোথায়? তার মন ফের ধেয়ে গেল নেকড়ের পালের দিকে। আতঙ্ক নিয়ে তাকালো। প্রাণী-গুলো এখন বাঁদিক থেকে অনেকটা ডানদিকে সরে গেছে দেখা যায়। দৌড়ে আসছে অবশ্য একই দিক লক্ষ্য করে। তারা কি গন্ধ পেয়েছে মানুষের? লংকাম টেরেন-এর?

লংকাম টেরেনও গতি বাড়িয়ে দৌড় শুরু করলো। তার অনুমান এক মাইলের মতো পথ বাকী। ওই পথের শেষেই তার জীবনের নিরাপত্তা হাতছানি দিচ্ছে!

প্রাণের ভয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে লংকাম টেরেন্। তার পায়ের আঘাতে ছিট্‌কে যাচ্ছে বরফের গুড়ো। নেকড়েগুলো তার কাছ থেকে আর কত-দূরে রয়েছে? ঘাড় ফিরিয়ে সেটা দেখতে হলে দৌড় থামাতে হয়। আর সেই অবসরে আরও কিছুটা পথ হিংস্র প্রাণীগুলো এগিয়ে আসবে তার দিকে! কাজেই, আর থামা নয়! দৌড়···দৌড়···দৌড়। পা দুটোতে যন্ত্রণা হচ্ছে। দম আটকে আসছে বুকের ভেতরে। এ অবস্থায় লংকাম টেরেন্-এর কেবলই মনে হতে লাগলো, এই বুঝি শত্রু চোয়ালের তীক্ষ্ণ দাঁত পেছন থেকে তার পায়ের গোড়ালির কাছে চেপে বসে।

না। শেষ পর্যন্ত নিরাপদেই নিজের গুহায় ফিরতে পারলো লংকাম টেরেন্। গুহামুখের পাথর সরিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকলো অভ্যন্তরে। অন্ধকার থিক্ থিক্ করছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে সে দম নিল। তারপর ছোট টর্চ জ্বেলে বের করলো অক্ষত দ্বিতীয় রাইফেলটা। গুহার মুখের দিকে সেটার নল তাক করে বসে রইলো। বাইরের অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতাও আবার পীড়া দিচ্ছিল লংকাম টেরেন্‌কে। শেষ পর্যন্ত কী হলো ব্যাপারটা? নেকড়ের পাল আসলে কি তার গন্ধ পায়নি? তারা অন্যদিকে চলে গেল নাকি?

আহত ক্ষিপ্ত এক চক্ষু দানবটারই বা খবর কী?

লংকাম টেরেন্-এর পিছু ধাওয়া সেটা করেছিল কত দূর পর্যন্ত ?···

···এই পর্যন্ত গল্পটা বলে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে চুংকুদা দুষ্টু হাসি হাসতে লাগলো। আগের সিগারেটটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ফের দু'নম্বর তার ঠোঁটের ফাঁকে আশ্রয় নিল। গল্প থেমে রয়েছে। সময় চলে যায়। আমরা সবাই প্রবল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকি চুংকুদার মুখের দিকে। চুংকুদা কিন্তু আমাদের মুখের দিকে আর তাকায় না। তার দুচোখ এখন বোজা। ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট। গুহার বাইরের নিস্তব্ধতা লংকাম টেরেন্কে পীড়া দিচ্ছিল—চুংকুদার কাছে শুনলাম। কিন্তু আমাদের সবাইকেও যে চুংকুদার এই নীরবতা রীতিমতো শাস্তি দিচ্ছে! চুংকুদা কি এটা বোঝে না ?

অস্থির গলায় বুকাই প্রথম বলে উঠলো, 'তারপর ? তারপর, চুংকুদা ? গপ্পটা শেষ করো।'

এবার চুংকুদা তার চোখের পাতা ওপন্ করলো। তবু আমাদের মুখের দিকে তাকালো না। শুধু সিগারেটের মুখের আগুনের দিকে তার নজর। সিগারেটটা আঙুলের ফাঁকে রেখে বার বার তাকাচ্ছে। ধৈর্য হারিয়ে আমরা কোরাসে বলে উঠলাম, 'তারপর ? চুংকুদা, লংকাম টেরেন্-এর ভাগ্যে কী ঘটলো শেষ পর্যন্ত ?'

চুংকুদা বলতে লাগলো :

·· অন্ধকারে বসে খানিকবাদে লংকাম টেরেন্-এর কিছুটা নিশ্চিন্তবোধ হতে লাগলো। তখন গুহার বাইরেটা এক নজর দেখে নেবার জন্যে অতি সাবধানে সে উঁকি মারলো। আকাশে বোধ হয় চাঁদ উঠেছে। স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে অনেক কিছু। বাইরের দৃশ্য দেখেই ফের তার শরীরের লোম কাঁটার মতো খাড়া।

সে দেখতে পেল, নেকড়ের পাল তার গুহার দিকে তাকিয়ে অসীম ধৈর্য নিয়ে চুপচাপ বসে রয়েছে। মানুষের ঘরে পোষা জন্তু জানোয়ারগুলো যেমন ভাবে খাবার দেবার সময়ে বসে বা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে, ঠিক সেইভাবে।

লংকাম টেরেন্-এর মনে হলো, গুহার বাইরের দিক লক্ষ্য করে যদি একটা ফায়ার করা যায়, তাহলে ভয় পেয়ে হিংস্র জানোয়ারগুলো ওখান থেকে পালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু পালিয়ে গিয়েও যদি ফের ফিরে এসে জড়ো হয় ? কিংবা তার রাইফেলের আওয়াজ শুনে যদি সেই আহত ভালুকটাই তাকে খুঁজতে খুঁজতে এসে হাজির হয়ে যায় এখানে ?

লংকাম টেরেন্-এর পক্ষে এখন উভয় সঙ্কট। তাকে ছিঁড়ে খাওয়ার আশাতে নেকড়ের পাল ধৈর্য নিয়ে প্রতীক্ষা করছে। ওদিকে আহত ক্রুদ্ধ দানবটি প্রতিহিংসা নেবার জন্যে হয়তো এখনও আশেপাশে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে। কাজেই গুলিভরা রাইফেল গুহার মুখের দিকে তুলে ধরে সেও অনাগত বিপদের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়েই বসে রইলো চুপচাপ।

ওইভাবে কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পরই হঠাৎ গুহার বাইরে নেকড়েদের দৌড়ঝাঁপ চিৎকার শুরু হয়ে গেল। জন্তুগুলো কি এতক্ষণ পরে ধৈর্য হারিয়ে ফেললো ? কী ব্যাপার ? লংকাম-টেরেন্-এর বুকটাও দ্বিগুণ ভয়ে ছাঁৎ করে উঠলো। রাইফেলের গায়ে তার হাত দুটো চেপে বসলো শক্ত হয়ে। সে নিজে আর স্থিরভাবে থাকে কী করে ? গুহার ভেতর থেকে গোপনে বাইরের দিকে উঁকি মেরে দেখলো—ব্যাপারটা কী ?

হ্যাঁ। শেষ পর্যন্ত এখানে এসে পৌঁছলেন সেই এক চক্ষু দানব। আর, এসেই নেকড়ের পালের সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে বসেছে। আহত অবস্থায় প্রাণীটার এ এক বেপরোয়া ভয়ঙ্কর হিংস্র মূর্তি। নেকড়েরা গোল হয়ে ঘিরে ধরে তাকে আক্রমণ করেছিল আগে। শেষে একে একে, জোড়ায় জোড়ায় আক্রমণ চালিয়ে গেল। পেছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে সুতীক্ষ্ণ থাবা দিয়ে একাই প্রচণ্ডভাবে লড়াই করে চললো ভালুকটা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে লড়াই চললো। জানোয়ারগুলোর মিলিত উৎকট চিৎকারে ভরে রইলো অরণ্যভূমি। দুটো নেকড়ের ছিন্নভিন্ন দেহ পড়ে রইলো ভালুকটার পায়ের কাছে। একটা নেকড়েকে ভালুকটা এমন প্রচণ্ডভাবে হাড়ভাঙা থাপ্পড় কষালো যে সেটা দূরের একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে সপাটে ধাক্কা খেয়ে পাথরের ওপরে পড়েই নিথর।

তবু নেকড়েগুলো ভালুকটাকে রেহাই দিতে চায় না। সেটার ওপরে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে কামড়িয়ে সেটাকে প্রতিমুহূর্তে পরাস্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলো।

আহত ভালুকটা ক্ষিপ্ত নেকড়েদের সঙ্গে ওভাবে একা আর কতক্ষণ লড়তে সক্ষম হবে? জন্তুটার

ভঙ্গীতে ক্রমশ অসহায়তার ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। লড়াই করতে করতে ক্লান্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে বোঝা যায়। লোমের আড়ালে দেহটাও ক্ষত-বিক্ষত। সাহসও হারিয়ে ফেলেছে। এখন রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে প্রাণে বাঁচতে চায়। হিংস্র ক্ষিপ্ত নেকড়েরা সেটাকে সঙ্গে সঙ্গে ঘিরে ধরে, পালাতে দেয় না।

দৃশ্যটা চোখে দেখতে দেখতে লংকাম টেরেন-এর মনে ভালুকটার জন্যে কেমন একটু মায়ার সঞ্চার হলো। এই লড়াইয়ে সেটাকে একটু সাহায্য

করার জন্যে তার হাতের রাইফেল থেকে হঠাৎ দুম্ করে ছুটলো গুলি। তাতেও একটা নেকড়ে খতম। তারপরই দেখা গেল, ভীত সন্ত্রস্ত নেকড়ের পাল রণে ভঙ্গ দিল। তাদের সমবেত চিৎকার আদিম অন্ধকারে ক্রমশ মিলিয়ে গেল।

এবার শুধু তুমি আর আমি! লংকাম টেরেন্ চ্যালেঞ্জ জানালো একচক্ষু দানবকে। গুহার বাইরে বেরিয়ে এলো সে পা পা করে। অতি সতর্ক হাতে সেটাকে লক্ষ্য করে রাইফেল তুললো। ভালুকটাও দেখতে পেল তাকে। দেখে চিনতে পারলো কি? কয়েক মুহূর্ত পেছনের পায়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সেটা। পায়ের কাছে পড়ে দুটো রক্তাক্ত নিহত নেকড়ের দেহ।

হঠাৎ একটা নতুন চিন্তা বিদ্যুতের মতো ঝিলিক্ দিয়ে গেল লংকাম টেরেন্-এর মনের কোণে। উদ্যত রাইফেল ধীরে ধীরে ফের নামিয়ে ফেললো সে। আর যাই হোক, এই ভালুকটাইতো তার জীবন রক্ষা করলো। নেকড়ের সমস্ত পালটাকে খতম করে দেবার মতো তার রাইফেলে গুলি ছিল না। একটি বোবা জানোয়ার। আত্মরক্ষার জন্যে লড়াই করেছে। সেটাকে লংকাম টেরেন্ কী করে খতম করে? ভাইটি সেটাকে একদিন আক্রমণ করেছিল বলেই না তাকে ওইভাবে প্রাণ দিতে হয়েছিল? প্রতিশোধ নেবার জন্যে এখন সেটাকে গুলি করে হত্যা করার পক্ষে লংকাম টেরেন্ কোন যুক্তি খুঁজে পেল না। সে মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালো, এক চক্ষু আহত জীবটা যেন আর বোকার মতো তার দিকে না এগিয়ে আসে।

ভালুকের সুস্থ চোখটা লংকাম টেরেন-এর মুখের দিকে স্থির হয়ে রইলো কিছুক্ষণ। লংকাম টেরেন-এর দৃষ্টিও সেটার দিকে স্থির, অনড়। তারপর সেটা আস্তে আস্তে নেমে চারপায়ে দাঁড়ালো। সেখান থেকে চলে যাওয়ার আগে ঘাড় ঘুরিয়ে লংকাম টেরেন-এর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল সেটা শেষ বারের মতো। মনের কোণে এক অপূর্ব অনুভূতি নিয়ে লংকাম টেরেন্ সেটার গমন পথের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে। চারপাশের আদিম প্রকৃতিও তার সঙ্গী হয়ে সেই মনোরম দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলো।

[ভূঁত্রাক্ষস : ২৩ পৃষ্ঠায় পর]

আছে এবং তা একটা জলজ্যান্ত মানুষেরই। কারণ তাতে চুল আছে।

ভাঙা রাইফেল ফেলে দিয়ে দুহাতে ওর চুল খামচে ধরতেই ঢুণ্ডুবাবাজী বেকায়দায় পড়ে মানুষের গলায় আর্তনাদ করল, 'উঃ! উহু হু! গেছিরে! গেছিরে! ছাড়, ছাড়! মরে গেলুম রে!'

কর্নেলের সাদা দাড়ি এবং টাক ধূলোয় ধূসর। টুপি আর টর্চ কুড়িয়ে ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে বললেন, 'ঢুণ্ডুবাবাজীকে নিয়ে এস ডার্লিং! মহা তাঁদোড় ব্যাটাচ্ছেলে।'

ঢুণ্ডু লক্ষ্মীছেলের মতো বলল, 'আহা টানে না এত। চলো না, যাচ্ছি। আমার চুল টানলে বেজায় লাগে যে!'...

ভূত্রাক্ষস বা ঢুণ্ডুর পরিচয় পাওয়া গেল রামগড় থানায়। কর্নেল বললেন, 'কলকাতার বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী ভবরঞ্জন বক্সীর অন্তর্ধান রহস্য তাহলে ফাঁস হল। কিরিবুরু হান্টিং লজে রামগড়ের রাজা একটা পাতাল-কক্ষ বানিয়েছিলেন শুনেছিলুম। বক্সী তার খোঁজ পেয়ে সেখানে গুপ্ত ল্যাবরেটারি করেছিলেন বোঝা যাচ্ছে। মানুষের মাংস থেকে উন্নত জাতের মানুষ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। পাগল আর কাকে বলে? মাঝখান থেকে সাতটা লোকের প্রাণ গেল। ইস্পাতের পোশাক পরে মানুষ চুরি করতেন। গুলি বিঁধবে কেমন করে? তবে ওই চেহারা দেখেই হতভাগা লোকগুলো ভিরমি খেত।'

বিকেলে কর্নেল পুলিস অফিসারদের সঙ্গে কিরিবুরু গেলেন পাতাল ল্যাবরেটরি দেখতে। বক্সী মশাই আইনের চোখে খুনী। তাঁর বিচার হবে। সে যাই হোক, আমি সার্কিট হাউসেই থেকে গেলুম। মানুষের পচা-গলা মাংস দেখতে যাবার ইচ্ছে আমার ছিল না।....

রহস্যময় রায়

[সম্পূর্ণ উপন্যাস]

বেলা পড়ে আসতেই ঘাট-পথ শুরু হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক অন্ধকার করে ঝড়ের কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। এদিকে এই পাহাড়ি অঞ্চলে এমনিতেই বৃষ্টি বেশী। তা বলে ঝড় তুফান সব সময়ে হয় না। গাড়ি চালাচ্ছিল ডেমিংগো, সামনের বাঁকের দিকে তাকিয়ে ও বলল, 'এ তো দেখছি এখুনি তুফান আরম্ভ হয়ে যাবে, ক্যারোলিন আর কতটা পথ বাকী আছে বলতে পারিস ?'

ক্যারোলিন গাড়ির বাইরের দিকেই দেখছিল। বেশ চিন্তায় পড়েছিল ও। সেই কবে যখন ওর বয়স পাঁচ কি ছয়, ও ওর মার সঙ্গে একবার এসেছিল এদেশে। পাহাড়ি চড়াই উৎরাই, পাইনের বন আর একটানা বৃষ্টির কথা কিছু কিছু মনে পড়ে ওর। তবে সে স্মৃতি বড় অস্পষ্ট। তারপর বার চোদ্দ বছর কেটে গেছে, ওর আর কোনও যোগাযোগ নেই এদিকের সঙ্গে। থাকতও

না। হঠাৎ একটা অদ্ভুত উড়ো চিঠি ওদের আজ টেনে এনেছে এদিকে। চিঠিটায় লেখা ছিল, 'স্নেহের নিনা, বহুদিন তোমাদের কোনও খবর পাই না। আশা করি ভালই আছ। আমার অবস্থা তত ভাল নয়। শরীর ভেঙ্গে পড়েছে, আজ আছি কাল নেই, তিন কুলে আমার তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। আমার বিষয় আশয় যা কিছু তা তো তুমিই পাবে। যদি একদিন এদিকে আসো তো খুব খুশি হব। সেই কবে তোমাকে দেখে ছিলাম, আবার দেখতে বড় ইচ্ছা করছে। হতভাগ্য বুড়োর কথা ভেবে যদি আসো তো কিযে খুশি হব। শুভেচ্ছা রইল। ইতি তোমার দাদু ম্যারিও।'

ক্যারোলিনের মার মামা এই ম্যারিও দাদু। সরকারের সেনা বিভাগে বড় অফিসার ছিলেন। লোকও ছিলেন বড় ভয়ঙ্কর। ভয় ডর এসব তো কাউকে কিছুকেই করতেন না। কারও তোষামোদের ধারও ধারতেন না।

ম্যারিও কার্ভালো সেনা বিভাগ থেকে ছুটি পেলেন যখন তখন সবে পাহাড়ি সহর গোলাঞ্জ নগরের পত্তন শুরু হয়েছিল। ভারতীয় খ্রীস্টানদের এক এক ধর্মমতাবলম্বিরা তখন এদিকে ওদিকে নানান জায়গায় ছোট ছোট সহর গড়ে তুলছিলেন। গোলাঞ্জ নগর তেমনি একটা জায়গা। সেখানে বাগান ঘেরা বাংলো বাড়ি বানালেন ম্যারিও কার্ভালো। ওঁর একমাত্র ছেলে তখন বিলাতে এঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। স্ত্রী আর ছোট মেয়েকে নিয়ে গোলাঞ্জ নগরে বাস করতে থাকলেন তিনি। কিন্তু এমনই ভাগ্য ওর, পথ দুর্ঘটনায় ছেলে বিলাতে মারা গেল। কদিন বাদে, গভীর এক খাদের মধ্যে মেয়ের দেহ পাওয়া গেল। ও বোধ হয় পা ফস্কে পড়ে গেছিল। পর পর এমন দুটো আঘাত মিসেস কার্ভালো সইতে পারলেন না। তিনিও মারা গেলেন। গোলাঞ্জ নগরের বিশাল বাগান ঘেরা বাড়িতে একলা পড়ে রইলেন ম্যারিও কার্ভালো।

এই সময়েই মার সঙ্গে ক্যারোলিন এসেছিল মার মামার বাড়িতে। মা ছাড়া তখন ম্যারিও দাদুর আর আপন বলতে কেউ ছিল না।

দাদু ওর মাকে বহু অনুরোধ করেছিলেন ওখানেই পাকাপাকি ভাবে থেকে যাওয়ার জন্য। কিন্তু মা রাজী হন নি। হন নি, কারণ ক্যারোলিন তখন স্কুলে পড়ত। তাছাড়া মা ও কাজ করতেন এক বড় বিদেশী কোম্পানিতে। সেখানেই ক্যারোলিনের বাবা বড় অফিসার ছিলেন।

ক্যারোলিনের বাবাও তখন বেঁচে ছিলেন না। ওর যখন খুব ছোট্ট বয়স তখনই তিনি মারা যান অসুখে। বাবার ছবি দেখলেও তাঁর কোন কথা কিন্তু ওর মনেই নেই। ম্যারিও দাদুকে দেখে কিন্তু ভালই লেগেছিল ক্যারোলিনের। কিন্তু তখন মা কিছুতেই ওখানে থাকতে চাইলেন না।

তারপর কত বছর হুহু করে কেটে গেছে। ক্যারোলিন এখন কলেজে পড়ছে, ওর মাও মারা গেছেন। ও এখন থাকে পিসীর কাছে। পিসেমশাই পুলিশের কাজ করেন। তার ছেলে ডেমিংগোও কাজ করে সরকারি অফিসে।

দাদুর চিঠি হঠাৎ পেয়েই ওদের মাথায় মতলব এল। কলেজ ছুটি এখন, ডেমিংগোরও ছুটি পাওনা আছে অফিসে। ওদের দুজনের একান্ত বন্ধু রডরিগের নিজের গাড়ি আছে। ওরা খুবই বড় লোক। ঠিক হল তিনজনে গাড়িতে সোজা পাড়ি দেবে গোলাঞ্জ নগরের দিকে। ব্যাপারটা হবে দারুণ অ্যাডভেঞ্চারের। পালা করে গাড়ি চালাবে রডরিগ আর ডেমিংগো। ক্যারোলিন

শুধু ওদের সঙ্গ দেবে।

ক্যারোলিনের পিসেমশাই এব্যাপারে খুব উৎসাহ দেখালেন। রাস্তার ম্যাপ জোগাড় করে কোথায় কোথায় ওরা রাত কাটাবে, পথে কি কি জিনিস লাগবে, সব কিছুর ব্যবস্থা করে দিলেন।

যাত্রার আগের দিন ডেমিংগো আর ক্যারোলিনকে অবাক করে দিয়ে রডরিগের বাবা বললেন, 'তোমরা জান না, রডরিগের এক আপন কাকা, গোলাঞ্জ নগরে থাকেন।' একথা বলে তিনি থামলেন। কি যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ, তারপর আবার বললেন, 'থাকেন, বলাটা বোধ হয় ঠিক হল না। কারণ, গত চোদ্দ পনের বছর তার সঙ্গে আমাদের কোনও যোগাযোগ নেই। রডরিগ তো জানেই না তার এক কাকা আছে। আসলে কি জান, সে খুব ছোট বয়স থেকেই একদম বিগড়ে যায়। বদ সঙ্গে পড়ে এহেন বদকাজ নেই, যা না করে। শেষ পর্যন্ত জেলও খাটে বহুবার। বাবা ওকে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করেন। ও কিছুদিন এদিক সেদিক করে লটারিতে হঠাৎ অনেক টাকা পেয়ে গোলাঞ্জ নগরে চলে যায়। সেখানেই নাকি বাড়ি করে বাস করত। তার শেষ খবর পাই প্রায় বছর পনের আগে। তখন সে বদ সঙ্গ ছেড়ে ভালোভাবেই জীবন কাটাচ্ছিল। তারপর ইচ্ছা করেই সে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়ে। রডরিগের বয়স তখন কত হবে, এই পাঁচ কি ছয়।' ক্যারোলিন জিজ্ঞাসা করল, 'কাকা, আমাদের ওই কাকার নাম কি?'

'সবাই ওকে সিবাস্টিন বলে ডাকত। পুরো নাম, সিবাস্টিন ফ্রান্সিস গোমেস। আমার থেকে অন্তত পাঁচ বছরের ছোট হবে ও।'

'কাকার সঙ্গে কি আমরা দেখা করব বাবা?' জিজ্ঞাসা করল রডরিগ। 'দেখ, তিনি যখন ইচ্ছা করে আমাদের সঙ্গ ছেড়েছেন, তখন তোমাদের যে কি ভাবে উনি নেবেন, তা বলতে পারি না। তবে শত হোক সে আমার ভাই। আমি তার মঙ্গলই চাই। দেখা করবে তোমরা। তবে খারাপ ব্যবহারের জন্য তৈরি হয়ে যেও।'

একথা শুনে হেসে ডেমিংগো বলল, 'আমাদের দাদুর বাড়ি থাকতে পথে পড়ব না যখন আমরা, তখন ওঁর ব্যবহারে কি আসে যায়? তা ছাড়া এখন তো ওঁরও অনেক বয়স হয়েছে। হয়ত একদম বদলেই গেছেন উনি। আমরা ওঁকে খুঁজে বার করব।'

রডরিগদের বাড়ির সামনে থেকে গাড়ি ছাড়ার ঠিক আগে, এক বিরাট বোঝা কাঁধে হন্তদন্ত হয়ে রোগা লম্বা একজন ভদ্রলোক এসে হাজির। বিনা ভনিতায় গাড়ির পিছনের দরজা খুলে বিরাট বোঝাটা প্রায় ক্যারোলিনের গায়ের উপরে তুলে দিয়ে বললেন, 'যাক দেরী করে ফেলিনি দেখছি। ওকি রডরিগ তুমি যেমন ভাবে তাকিয়ে আছ তাতে তো মনে হচ্ছে তুমি আমাকে চিনতে চাও না। আরে, আমি কোনও উঠকো লোক নই। আমি রডরিগের মামা। তোমরাও আমাকে মামা বলে ডাকতে পার। বড় বেয়াড়া আমার নাম, আলফান্সো কোয়েলো। খাঁটি পোর্তুগীজ সাহেব। পাঁচ পুরুষে গায়ের রঙটা যা কম হয়ে গেছে। তা হোক, মেজাজ ঠিক আছে সেই বুকানিয়ারদের মত। এত বড় অ্যাডভেঞ্চার কখনও আমাকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। তাছাড়া হিন্দুরা বলে তেরস্পর্শ যোগ, ওটা বাপু আমিও মানি। নেটিবদের সঙ্গ দোষ আর কি, তাই চলে এলাম। নাও নাও গাড়ি ছাড়। দেরী হলে ওদিকে রোদ উঠে যাবে।'

চারজনেই ওরা বার হয়ে পড়ল। কোয়েলো

মামার মত মানুষ হয় না। নাম যাই হোক, ষোল আনা ভারতীয় উনি, দেশকে ভালও বাসেন খুব। এই ভালবাসা থাকার জন্যই সারা জীবন শুধু এই দেশ ভ্রমণ করেই কাটিয়ে দিয়েছেন। কলকাতায় সাহেব পাড়ায় বড় একটা বাড়ি ভর্তি ভাড়াটে। তাদের ভাড়া থেকেই ওর দিন চলে।

কোয়েলো মামাও গাড়ির বাইরের দিকে দেখছিলেন, বললেন, 'পাহাড়ি বৃষ্টি' আরম্ভ হলে সহজে থামবে না। ডেমিংগো, সামনে পথের ধারে কোথাও কোন হোটেল দেখলে গাড়ি থামাও। এসেইতো প্রায় গিয়েছি। কাল ভোরেই নয় গোলাঞ্জ নগর যাওয়া যাবে।'

ডেমিংগো অন্ধকারে চোখ বড় বড় করে সামনের দিকে দেখছিল, বললো, 'যা প্যাঁচানো পথ, এত অন্ধকারে চলতে ভয়ই হচ্ছে। মন্দ বলেননি, সামনে কোনও আশ্রয় পেলে রাতের মত থেকেই যাব।'

রডরিগ জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কি কিছুই মনে পড়ছে না লীনা, সামনে কোথাও কি হোটেল আছে?'

ক্যারোলিন হেসে বলল, 'হ্যাঁ পাঁচ বছর বয়সে দেখা স্মৃতি পনেরো বছর পরে আর কারও মনে আছে, বৃষ্টি বৃষ্টি, শুধু বৃষ্টি পড়ত রাত দিন। আর মাঝে মাঝে কুয়াশা ভেদ করে দূরের বরফের চূড়া-গুলো দেখা যেত। ব্যস, এই আমার গোলাঞ্জ নগরের স্মৃতি।'

কোয়েলো মামা হঠাৎ বললেন, 'দেখ দেখ, সামনে পথ দুভাগ হয়ে গেছে। একটা বাঁয়ে বাঁক খেয়ে গেছে। অন্যটা ডাইনের ঢালে নেমে গেছে মনে হচ্ছে। কোন দিকে যাব আমরা?

ডেমিংগো গাড়িটা থামাল জোড়া পথের মুখে। রডরিগ লাফিয়ে নেমে ছুটে গেল ডানদিকের ঢাল

পথের দিকে। অন্ধকারে টর্চ জ্বেলে এদিক-ওদিক দেখতে লাগল। হঠাৎ ওর নজরে পড়ল একটা মোটা খুঁটির দিকে। তার গায়ে টিনের লম্বা পাত লাগান। আলো ফেলে দেখল, কি যেন লেখা আছে তাতে। কাছে গিয়ে কষ্ট করে পড়ল লেখা আছে। জি, তারপর ফাঁক দিয়ে এল, এ, এন। বাকী অক্ষরগুলো সব মুছে গেছে। নীচে একটা তীর চিহ্ন আঁকা। তা ঢাল পথটাই দেখাচ্ছে। আর কোনও সন্দেহ নেই এ পথই গোলাঞ্জ নগর গেছে। হাত নেড়ে ও ডেমিংগোকে এদিকেই আসতে বলল। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক কাঁপিয়ে প্রচণ্ড শব্দে কাছেই কোথায় যেন বাজ পড়ল। থতমত খেয়ে গেল রডরিগ। নিজেকে ও সামলে নেবার আগেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে চারদিক অন্ধকার করে বৃষ্টি আরম্ভ হল। কি বড় বড় ফোঁটা, সঙ্গে চড়বড় করে শিল পড়তেও আরম্ভ হল। ছুটে এসে গাড়িতে উঠে পড়ল রডরিগ, বলল, ঢাল পথটাই গোলাঞ্জ নগর গেছে। তা হলে মনে হয় আমরা এসে গিয়েছি।'

কোয়েলো মামা বললেন, 'তাহলে খুব আস্তে আস্তে এগোলে হয়। এমন বৃষ্টিতে পথের মাঝে থেমে থেকেও তো লাভ নেই।'

'তুই সর, আমি স্টিয়ারিং ধরি।' বলল রডরিগ, 'অনেকক্ষণ চালালি।' ডেমিংগো হেসে বলল, 'এখন নেমে তোকে জায়গা দিতে পারব না আমি। বাইরে থান ইটের মত বড় বড় শিল পড়ছে। মাথা গুঁড়িয়ে যাবে আমার।'

কথার শেষে গাড়ি ছেড়ে দিল ও। হেড লাইটের আলোয় রাস্তার অনেকটা দেখা গেলেও বৃষ্টিতে সব কিছু ঝাপসা। দুপাশে গভীর জঙ্গল। একপাশে জঙ্গলের শেষে আকাশ ছোঁয়া পাহাড়ের ঢাল উঠে গেছে। বৃষ্টিতে জায়গায় জায়গায় পাগলা ঝোরা নেমেছে। সামনে পথ বাঁয়ে ক্রমেই বেঁকে চলেছে, ক্রমেই ঢালে নেমে গেছে। সে-পথ যত এগিয়ে গেছে ততই আগাছা ঝোপ-জঙ্গলে ভরা। আগাছা ঝোপ-জঙ্গল পথের মাঝেই গজিয়ে উঠেছে। পথও জায়গায় জায়গায় এত খারাপ যে, বেশ কিছুদিন কোনও মেরামত করা হয়নি তা বোঝা যায়। এসব দেখে কোয়েলো মামা অবাক হয়ে বললেন, ব্যাপার তো ভাল মনে হচ্ছে না, এদিকে লোক চলাচল নেই বলেই মনে হচ্ছে হে। তার মানে অন্য দিকে আর একটা পথ আছে। সে পথেই আজকাল যাতায়াত হয়। ড্রাইভার হুঁশিয়ার, ব্রেকে পা রেখো, স্পিড তুলোনা, ভুল পথে এসে পড়েছি আমরা।'

ওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার কোথায় যেন ভীষণ শব্দে বাজ পড়ল। সবাই চমকে উঠল। ডোমিংগোর হাত কেঁপে গাড়ি প্রায় পথের বাইরে গিয়ে পড়ছিল। শেষ মুহূর্তে ও কোনমতে তা সামলালো। কোয়েলো মামা কাঁপা গলায় বললেন, এত বৃষ্টিতে তো কখনও বাজ পড়ে না। আজ দেখছি সবই কেমনতর!'

ক্যারোলিন বলল, সামনে খোলা জমির শেষে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে না? হোটেল নয় তো?'

'হোটেল হলে আজ রাতে ওখানেই থামব।' বলল ডেমিংগো।

'তা আর বলতে?' বলল রডরিগ, 'বাজে আমার বড় ভয়। তাছাড়া এপথে বৃষ্টিতে আর না এগোনোই ভাল।'

'কিন্তু এপথে কি হোটেল থাকবে?' কেমনভাবে যেন জিজ্ঞাসা করলেন কোয়েলো মামা, 'এপথে তো লোকজন চলে না বহুদিন।'

একথার ওরা কেউ কোন উত্তর দিল না। গাড়ির হেডলাইটের আলো বাড়িটার গেটের উপরে পড়তেই সকলেই অবাক হয়ে দেখল খুঁটির গায়ে ব্রাকেটে লটকানো একটা নেম-প্লেট হাওয়ায় ভীষণ ভাবে দুলছে। যখন সিধা হচ্ছে স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে তাতে লেখা আছে, 'ভ্যালিভিউ ট্যাভার্ন'

'হোটেল।' খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল ক্যারোলিন।

'তার মানে গরম খাবার আর নরম বিছানা। যা ঠাণ্ডা পড়েছে, এক ঘুমে রাত কাবার করব!' বললেন কোয়েলো মামা, 'গাড়ি থামাও হে।'

হাতঘড়িতে রাত্রি কত হয়েছে দেখল রডরিগ। তা রাত প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। কিন্তু একি, ট্যাভার্নের কোথাও তো কোন আলো জ্বলছে বলে মনে হচ্ছে না। তবে কি ঝড়জল দেখে এরই মধ্যে সবাই দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে। গাড়িটা ফটকের কাছে থামতেই দেখল ওরা ট্যাভার্নের দরজা বন্ধ। কোথাও কোনও মানুষ-জনের সাড়া নেই। বৃষ্টিও তখুনি যেন আরও ঝেঁপে নামল। গাড়ি থেকে ট্যাভার্নের দরজা পর্যন্ত যেতেই সবাই ভিজে যাবে। ছাতা চাই!···

[চলবে]

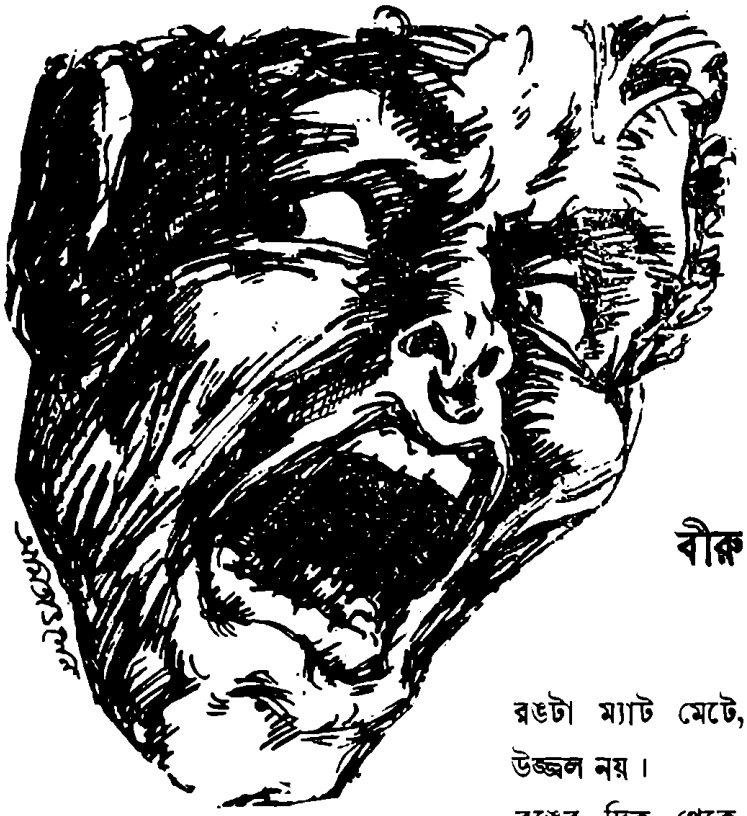

বিস্ময়কর এক গুনিন এর কাহিনী

বীরু চট্টোপাধ্যায়

[সত্য ঘটনা]

আজ আমি এমন একজন মানুষের কথা বলব, যেকিনা প্রাণী জগতের মধ্যে হিংস্র, কদাকার, নিকৃষ্ট শ্রেণীর জন্তু বুনো হায়নাদের, কি এক অদ্ভুত ক্ষমতা বলে, না কি কোন দৈব মন্ত্রের দ্বারা ঐ জন্মে-পোষ-না-মানা জীবদের তাঁবে এনে ফেলেছিল। কিভাবে যে ওদের বশে এনেছিল তা বুঝি তার ঈশ্বরই জানে।

লোকটির নাম, জন্নু। এই গুণিনের কথা বলবার আগে হায়নাদের আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

হায়না! যেমন আকৃতি, তেমনি প্রকৃতি। নাক মুখ চোখ কুকুরদের মত, কিন্তু গলাটা বেশ লম্বা। সামনের কাঁধটা উঁচু, তারপর সহসা লেজের দিকে, পিঠটা অস্বাভাবিক ভাবে নেমে গেছে। রঙটা ম্যাট মেটে, বাঘ বা চিতাদের মত উজ্জ্বল নয়।

রঙের দিক থেকে তিন প্রকারের হায়না আছে, লম্বা দাগওয়ালা, চিতাদের মত কালো ছাপ ছাপ ওয়ালা এবং ম্যাট মেটে বাদামী। এদের দাঁত ও চোয়াল সাংঘাতিক শক্ত। যে কোন কঠিন হাড় নিমেষে কড় মড়িয়ে গুঁড়ো করে ফেলতে পারে।

রাত্রিবেলা দেখলে মনে হবে এক জোড়া হলদে চোখ জ্বলছে অন্ধকারে। এদের কুৎসিত ঘৃণিত চেহারা যেমন, স্বভাবও তেমনি কদর্য। হিংস্র মাংসাশী, সবার উপরে ভীরু কাপুরুষ। বাঘ, সিংহ, চিতা বন্য সন্দেহ নেই; কিন্তু মানুষ তাদের সাহসকে প্রশংসা না করে পারে না। কিন্তু হায়নার সে সাহস নেই। সে নিশাচর, বন্য, হিংস্র কিন্তু ভীরু। দুর্বলের যম। দুর্বল, অসুস্থ ও অক্ষমকে সে আক্রমণ করে। আহত, অন্ধ বা খোঁড়াকে অথবা চুপিসাড়ে গ্রামে ঢুকে ঘুমন্ত শিশু বা নবজাত গো-মহিষ আক্রমণ করে খায়।

আফ্রিকার লোকেরা একটা ব্যাপারের জন্য এদের কিছু বলে না। সেটা হল এরা প্রাকৃতিক মেথরের কাজ করে থাকে। যত নোংরা আবর্জনা, পচাগলা পশুপাখি জন্তু জানোয়ার সব কিছু খেয়ে পরিষ্কার করে দেয়। এই ভাবে পরোক্ষে ওরা জনস্বাস্থ্যের উপকার করে থাকে।

বেশ কিছুকাল আগে পর্যন্ত ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস-আবাবার রাস্তা ঘাট একমাত্র এই যমের-অখাদ্য-জীব হায়নারাই পরিষ্কার রাখতো।

সে যাই হোক, দুনিয়ায় কেউ এই জন্তুটিকে দেখতে পারে না। এদের কোন বন্ধু নেই, কারুর সঙ্গেই বনে না এদের। অন্যে পরে কা কথা, স্বজাতি অপর হায়নাদের সঙ্গেও এদের ভাব নেই। বাগে পেলে এবং অসুস্থ হলে এক হায়নাই অপর হায়নার ওপর লাফিয়ে পড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে।

এমন যে প্রাণী, তাদেরও ভালবাসতো একটি লোক, নাম যার জন্নু। জন্নু জাতিতে সোমালী মুসলমান। ঠিক মুসলমানও বলা যায় না। খানিকটা বন্য ভবঘুরে আদিম প্রকৃতির মানুষ।

পরনে লেংটি, মাথায় বিরাট পাগড়ি। পশ্চিম ইথিওপিয়ার পাহাড় ঘেরা একটি স্থানে সে ঘর বেঁধে ছিল বউ পুত্র নিয়ে। আশে পাশের লোকেরা জানতো জন্নু একজন অদ্ভুত শক্তিধর ফকির। নানা প্রকার অলৌকিক মন্ত্রগুপ্তিও জানে। ওর অসাধ্য কাজ নাকি কিছু নেই।

একদা এক ইংরেজ দম্পতি আবিসিনিয়া ভ্রমণে গিয়ে এই তাজ্জব মানুষটির খবর পেয়ে দ্রুত জিপ গাড়ি নিয়ে উপস্থিত হয় এই ভবঘুরে ফকিরের কুটিরে।

তখন সন্ধ্যে হয় হয়। সাহেব মেম গিয়ে প্রবেশ করলেন ছনে-ছাওয়া গোলাকার একটা মাটির ঘরে। ঘরেতে কোন জানলা নেই—ঐ একটি মাত্রই দরজা। দরজার বাইরে কিছু দূরেই উঠে গেছে বিশাল এক পাহাড়।

লেংটি ও পাগড়ি পরা জন্নু ঘরের মধ্যে কেমন একটা ধ্যানস্থ-ভাব নিয়ে বসে ছিল। এক পাশে নোংরা চেহারার কতকগুলো ছেলে মেয়ে ঘুমোচ্ছে। অন্য পাশে বোরখা পরা দুটি নারী—বোধ করি মা এবং বউ।

সাহেব মেম গিয়ে দরজার দিকে মুখ করে ভেতরে বসলেন।

বেশ কিছুক্ষণ কাটলো অসহনীয় নীরবতায়। এক সময় শোনা গেল গুন গুন করে জন্নু যেন কি মন্ত্র আওড়াচ্ছে—শুনতে খানিকটা ইম-ইস-কুম-লু-আকবর-হুম ইস গোছের।

কতক্ষণ কেটে ছিল বলা মুস্কিল, সহসা মেমের কনুয়ের একটা ধাক্কা খেয়ে সাহেব সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলেন দরজার সামনে বাইরে একটি ছায়া—হায়নার ছায়া মূর্তি। স্তব্ধ বিস্ময়ে সাহেব-মেম

[৬৭ পৃষ্ঠায় দেখুন]

ভয়ঙ্কর সেই রাত

মঞ্জিল সেন

এক পড়ন্ত বেলায় আফ্রিকার উপজাতিদের কোন এক গাঁয়ের একজন তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে চলেছিল অন্য এক গাঁয়ে। নদীর উজানে ডিঙি তর্ তর্ করে এগুচ্ছিল। তবে ডিঙিটা ছিল খুব পুরনো, ফুটো-ফাটাও যে ছিল না এমন নয়। অন্য কেউ হলে ওই ডিঙি অনেক আগেই উলটে যেত, কিন্তু উপজাতিরা ছোটবেলা থেকেই অমন জীর্ণ ডিঙিতে চড়তে অভ্যস্ত, ডিঙির ভারসাম্য বজায় রাখার অদ্ভুত ক্ষমতা ওদের।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে অঘটন ঘটে গেল। খোলের ফুটো দিয়ে যে জল উঠছিল, ওরা হাঁটু গেড়ে দু' হাতের তালু দিয়ে সেই জল ছেঁচে ফেলছিল। হঠাৎ ওদের একজন ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল আর ডিঙি গেল উলটে। তিনজনেই ছিটকে পড়ল নদীর জলে।

তিনজনই জোয়ান ছেলে, দক্ষ সাঁতারু। জলে পড়ে ওরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছিল আর ডিঙিটাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল তীর লক্ষ্য করে। ডাঙ্গায় ওটার জল ছেঁচে ফেলতে সুবিধে হবে, তারপর আবার তাদের শুরু হবে যাত্রা। ওই ঘটনার সময় ওদের গাঁয়ের একদল লোক নদীর পাড়ে দাঁড়িয়েছিল। তারাও ওদের অবস্থা দেখে হাসছিল আর টিটকিরি দিচ্ছিল।

ওরা প্রায় ডাঙ্গার কাছে পৌঁছে গেছে এমন সময় ওদের একজন চিৎকার করে উঠল, তাকে কুমীরে ধরেছে। সে প্রাণপণ শক্তিতে ডিঙিটা আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করছিল, কিন্তু বৃথা সে চেষ্টা। একসময় তার দু'হাতের মুঠি আলগা হয়ে গেল আর সে তলিয়ে গেল জলের অতলে।

তার সঙ্গী দু'জন ততক্ষণে ডিঙি ছেড়ে দিয়ে প্রাণপণে সাঁতরে চলেছে তীরের দিকে। যারা নদীর ধারে দাঁড়িয়েছিল তারা চটপট ওদের টেনে তুলল। ওদের সঙ্গীর কিন্তু আর পাত্তা নেই, বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সবাই ফিরে গেল।

যাকে কুমীর টেনে নিয়ে গিয়েছিল, সে সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান হারিয়েছিল। জ্ঞান ফেরার পর সে দেখতে পেল নদীর তীরে দুর্গন্ধে ভরা একটা গুহার মধ্যে সে শুয়ে আছে। জলের ঠিক ওপরে ওই গুহাটা। বন্যার সময় মাটি ধসে অমন একটা খাদ বা গুহার সৃষ্টি হয়েছে। নদী থেকে একটা সরু নালা ওই গুহার মুখে গিয়ে মিশেছে, কুমীরটা ওই নালা দিয়েই টেনে এনেছে ওই উপজাতীয় যুবককে। ভীষণ একটা আতঙ্ক পেয়ে বসল ছেলেটিকে। ওর থেকে মাত্র এক ফুট দূরে, ওই নালার প্রবেশ মুখে আড়াআড়ি ভাবে দেখা যাচ্ছে কুমীরের লেজের খানিকটা। মাথাটা নদীর দিকে, বোধহয় আর যাতে কেউ না এসে তার শিকারে ভাগ বসায় তাই সতর্ক পাহারা দিচ্ছে। নালার মুখটা ওপর থেকে ঢালু হয়ে এসে জলে মিশেছে। ওই গুহার ছাদে একটা ছোট গর্ত দিয়ে দিনের শেষ আলো ভেতরে এসে পড়েছিল। সেই আলোতেই সব দেখতে পাচ্ছিল ছেলেটি। জায়গাটা স্যাঁত-স্যাঁতে, পচা হাড় মাংসের গন্ধে বমি আসে। শিকার ধরে এনে কুমীরটা বোধহয় ওখানে জমা করে, খিদে পেলে খায়, অর্থাৎ ওটা ওর ভাঁড়ার।

হঠাৎ কুমীরটা নড়ে উঠল। ছেলেটি ভাবল ওর অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু ওর ভাগ্য ভাল, ওই সঙ্কীর্ণ নালার কিছুটা বুকে হেঁটে কুমীরটা অদৃশ্য হয়ে গেল, বোধহয় দ্বিতীয় শিকারের আশায় আবার নদীর দিকে গেল।

ছেলেটি আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করল না, এমন সুবর্ণ সুযোগ আর হয়তো আসবে না। কুমীরের দংশনে ওর ডান উরু কালা কালা হয়ে গিয়েছিল, প্রচুর রক্তপাত হচ্ছিল, কিন্তু হাড় ভাঙেনি। মাথার ওপর যে গর্তটা ছিল, দু'হাত আর দু'হাতের নখ দিয়ে ছেলেটি পাগলের মত আঁচড়ে, খুঁড়ে সেটা বড় করবার চেষ্টা করতে লাগল। কুমীরটা যে কোন মুহূর্তে ফিরে আসতে পারে, তাহলে পালাবার আর সুযোগ পাওয়া যাবে না।

শেষ পর্যন্ত গর্তটা এমন বড় হল যা দিয়ে একজন মানুষ গলে যেতে পারে। হামাগুড়ি দিয়ে অতিকষ্টে শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে ওই গর্ত দিয়ে ও বেরিয়ে এল। ক্লান্তি আর অবসাদে ছেলেটি তখন বড় বড় নিশ্বাস নিয়ে হাঁপাচ্ছে, তবু পৃথিবীর মুক্ত বাতাস, নল খাগড়া আর বুনো ঘাসের গন্ধ ওকে নতুন জীবনের সন্ধান দিল। ও যেখানে আছে ঠিক তার নিচে ওই শয়তান কুমীরটার পুতিগন্ধময় ভাঁড়ার।

সূর্য অস্ত গেছে। দৌড়ে একটা ঝোপের আড়ালে ও লুকালো। ওর দিগ্‌ভ্রম হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু একটা কথাই ওর মনে ভাসছে, নদী থেকে যতটা সম্ভব দূরে পালাতে হবে, কুমীরের নাগালের বাইরে। তারপর একসময় ক্লান্তি আর রক্তক্ষয়ে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল জোয়ান ছেলেটি।

আবার যখন ওর জ্ঞান ফিরে এল, মাথার ওপর তখন চাঁদ সুধা বর্ষণ করছে। নিজের গাঁয়ের পথ খুঁজে পেল ছেলেটি। গাঁয়ের কাছাকাছি এসে নিজের লোকজন এবং বন্ধুদের নাম করে সাহায্যের জন্য ও চেঁচাতে লাগল। কুটিরগুলো অন্ধকার, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর চিৎকারে লোকজনের ঘুম ভেঙে গেল কিন্তু দেখা দিল আর এক বিপদ। গাঁয়ের সরল মানুষরা জেনেছিল ছেলেটিকে কুমীরে নিয়ে গেছে, কিছু লোক সে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। সুতরাং ছেলেটির বেঁচে থাকার কোন সম্ভাবনা নেই। কুমীর

[৬৭ পাতায় দেখুন]

বীরপুরুষ

ডাঃ অভিজিৎ দত্ত

ছোট্ট অমল যখন বন্ধুদের বোঝাতো, নিশুতি রাতে বাড়িতে চোর ঢুকলে সে কেমন সাহস করে পেছন থেকে লাফিয়ে চোরের চোখটা চেপে ধরে চোরের পিঠে সওয়ার হয়েছিল এবং কানামাছি ভোঁ-ভোঁ খেলতে খেলতে চোর নাজেহাল হয়ে নাকখৎ দিয়ে বলে গেছে অমলের বাবাকে, এ বাড়িতে কস্মিনকালে সে আর ঢুকবেনা···

কিম্বা আর একটু বড় হয়ে যখন সে বন্ধুদের কাছে গল্প করতো কিভাবে পদ্মপুকুরে সাঁতার কেটে পাশের বাড়ির ডুবন্ত মেয়েকে বাঁচিয়েছে অমল ··

কিম্বা আরও পরে যখন হিল্লীদিল্লী ঘুরে এসে বন্ধুদের বোঝাতো অমল, মুসৌরীতে সে সিয়া-এজেন্টের হাত থেকে বাঁচিয়েছে ইনডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টকে, আগ্রায় শিন্‌বেটের হত্তেল ইজরায়েলী ঘুঘু তার ক্যারটে-চপ্‌ খেয়ে জেহোভার বদলে আল্লাহ্‌-র নাম নিয়েছে, বোম্বেতে নামজাদা এক ফিল্মস্টারকে কিডন্যাপ হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছে অমল···

···অবিশ্বাসী কেউ কেউ তাকে গুলিস্ট্‌, গুলবাজ বলতো নিশ্চয়ই। কিন্তু তার বেশী কিছু হতোনা।

মুস্কিলটা হল, অমল যখন আরো বড় হয়ে কেরলের থিরুভাল্লায় ব্যাঙ্কের চাকরি পেল। এখন তার গালগল্পগুলো তার বন্ধুরা, তার পড়োশীরা, এমনকি তার সাতপাকের বউ সুমিতা অবধি বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। বীরপুরুষ হিসেবে নিজের ইমেজটা বউ, বন্ধু, পাবলিকের চোখে ঠিক রাখতে অমল বন্দুকের লাইসেন্স নিয়েছে। সে আজকাল বলে —গুণ্ডা-বদমাস যদি জানে যে তোমার কাছে বন্দুক আছে, তাহলে হয়তো সত্যিসত্যিই গুলি করার দরকার হবে না।

এমনিতে থিরুভাল্লায় শান্তি আছে, গুণ্ডামি-মস্তানির ঝামেলা নেই।

কিন্তু এরই মধ্যে একদিন....

দিনটা ছিল ১৯৮০ র ৭ই অক্টোবর।

কুয়েতে অনেককাল চাকরী করে শেষ জীবনটা

মীনাথালাকার কারিক্কন ভিলার বাড়িতে কাটাতে ওদের বাড়ি এসেছিল কে. সি. জর্জ এবং তার বউ র‍্যাচেল। কাচ্চাবাচ্চা নেই। সকালে ঝি এসে দেখলো রক্ত...রক্ত....রক্ত...রক্তের বন্যার মধ্যে শুয়ে আছে জর্জ ও র‍্যাচেল !! ওদের ছুরি মেরে খুন করা হয়েছে !!!

পুলিসের এস. পি, টি. পি. গোপিনাথ এবং সাবইনস্পেক্টর আবদুল করিম প্রথমেই খোঁজ নিলেন জর্জের আত্মীয়দের। খোঁজ নিয়ে জানা গেল জর্জের ভাইপো রেনী নামজাদা গুণ্ডা। মরিশাসের নাগরিক গুলাম মহম্মদ, মালয়েশিয়ার নাগরিক গুণশেখর আর কেরলের ছেলে দানিয়েল কিবেরো আছে তার দলে। অ্যারেস্ট হবার পর ওরা স্বীকার করলো, ওরাই গাড়িতে করে যায় কারিক্কন ভিলায় ও রেনীর কাকা-কাকীমাকে খুন করে ষাট হাজার টাকার জুয়েলারী, টেপরেকর্ডার আর ক্যামেরা চুরি করে। ওদের আদালতে সোপর্দ করা হল।

কিন্তু এর পরেই জেল থেকে পালালো রেনী জর্জ। ওয়ার্ডারের মাথায় লোহার ঘা মেরে লোবরা জেলের প্রাচীর ডিঙিয়ে পালিয়েছে। এখন থিরুভাল্লায় সবাই তার ভয়ে কাঁপে।

এরই মধ্যে সে একটা ব্যাঙ্ক লুট করেছে এবং একটা বোর্ডিংহাউসে হানা দিয়ে বাসিন্দাদের টাকাপয়সা ঘড়ি, গয়না হাতিয়েছে।

বীরপুরুষ অমলের মতে, ব্যাঙ্কের প্রহরীরা বেওকুফ। সময়মত গুলি চালালে....

এবং বোর্ডিং হাউসের বাসিন্দারা গাধা ! গুণ্ডা আসছে জেনেও সবাই যে যার ঘরে না থেকে যদি অন্ততঃ একজন বন্দুক নিয়ে গুণ্ডার খোঁজে বের হত এবং অন্য বাসিন্দারা যা অস্ত্র পাওয়া যায় তাই নিয়ে আনাচে কানাচে অপেক্ষা করতো···

স্বামীর বুদ্ধির অহঙ্কারে সুমিতার আজকাল মাটিতে পা পড়ছেনা।

থিরুভাল্লায় ভাড়া-বাড়ি পাওয়া শক্ত। তাই সেণ্ট পিটার বোর্ডিং হাউসের চারটে ঘর ভাড়া করে রয়েছে চারটে ফ্যামিলি। গুরণাম সিং কো-অপারিটিভের ম্যানেজার, শিখ হলেও রোগাপটকা, তুলনায় তার বউ শীলা ভারিক্কী। অশোক রাঁনেকর মহারাষ্ট্রের লোক, ফরেস্ট অফিসে চাকরী করে, লোকটা যেমন ঠাণ্ডা, ওর বউ জয়শ্রী তেমনি মুখরা। জোসেফ নাম্বুদ্রি এস, ডি, ও অফিসের স্টেনো, তার বউ ডোরা চার্চ আর চার্চের মহিলা সমিতি নিয়েই ব্যস্ত। নতুন বিয়ে হয়েছে এদের, বাচ্চাকাচ্চা নেই। প্রত্যেক ঘরের সঙ্গে অ্যাটাচড বাথরুম আছে, এক চিলতে রান্নাঘরও আছে। তক্তাপোষ, দেয়াল আলমারী, টেবিল, চেয়ার সমেত ফারনিশড ঘর। ভাড়াও কম। এতেই ওরা খুশী।

অবশ্য দারোয়ান গোপালনের একটু হাতটান আছে। ওর জ্বালায় জিনিসপত্র সাবধানে রাখতে হয়, এই যা ঝামেলা।

এই বোর্ডিং হাউসের একটু দূরেই ঝোপঝাড়ের মধ্যে একটা পোড়ো বাড়ি। এককালে নাকি স্থানীয় জমিদারের বাড়ি ছিল। এখন সরকার থেকে বাড়ি জমি সব কেনা হয়েছে। ওখানে এস, ডি, এম্-এর অফিস হবে।

পোড়ো বাড়িটার কোল ছুঁয়ে গেছে একটা খাল। তার দুধারে নারিকেল গাছ। বর্ষাকালে ওখানে গাঁয়ের লোকেদের নৌকো বাইচ কম্পিটিশন হয়। সেটা দেখার মত দৃশ্য।

....খারাপ খবরটা প্রথমে নিয়ে এল পুলিস কনস্টেবল। সাইকেল করে শহর ঘুরে সে বাড়ি বাড়ি খবর দিয়ে যাচ্ছে—'রেনী এদিকে আসতে পারে। সাবধানে থাকবেন !!'

এ শহরের থানায় সবশুদ্ধ পাঁচটা কনস্টেবল আছে কিনা সন্দেহ। ঝুট ঝামেলা হয়না বলে এতোই গেতো হয়ে গেছে যে এখন ঝামেলার নাম শুনলে এরা ভয় পায়। কনস্টেবলের মুখ দেখে মনে হল, বেচারা ইষ্টনাম জপ করছে।

'আপনাদের আর ভয় কি, দাশসাহেব আছেন, ওঁর বন্দুকের ভয়ে রেনী এদিকে আসবেনা'—গুরণাম, জোসেফ, অশোককে সান্ত্বনা দিয়ে গেল কনস্টেবল। সুমিতা গদগদ চোখে তাকালো স্বামী অমলের দিকে। কিন্তু দাশসাহেব অর্থাৎ অমল যে ভেতরে ভেতরে কাঁপছে, ওরা কেউ টের পেলনা।

পরের খবরটা আনলো বোর্ডিং হাউসের বয় ছোট্ট পদ্মনাভন্। 'রেনী কামিং ...বোট অন দ্য ক্যানাল... রেনী এনটারিং থিরুভাল্লা ম্যানসন'—বলেই হাঁফাতে হাঁফাতে পালালো হাফপ্যাণ্টপরা পদ্মনাভন্। বক্তব্য অতি প্রাঞ্জল।

খালের পথে নৌকোয় এসে রেনী ঢুকছে সামনের ওই পোড়ো বাড়িতে, এককালে যার নাম ছিল থিরুভাল্লা ম্যানসন।

বিড়বিড় করে গুরু নানক না গুরু গোবিন্দ, কার নাম নিচ্ছিল যেন গুরণাম সিং। তার স্ত্রী দশাসই চেহারার মহিলা শীলা একগাল হেসে বললো—প্ল্যানটা তো অমলবাবু আগে থেকেই করে রেখেছেন। ও আসছে, সুতরাং একজন বন্দুক নিয়ে ওর পেছনে যাবে।

অশোকের বউ জয়শ্রী সঙ্গে সঙ্গে মুখিয়ে উঠলো—'অমলবাবুর হাতে বন্দুক দেখলে রেনী এমন ভয় পাবে যে গুলি চালানোর দরকারই হবেনা।'

'ক্রাইস্ট ! হোলি মেরী !' প্রথমেই ইষ্টস্মরণ করে নিল ডোরা, তারপর বললো—'আমাদের কি করতে হবে ?'

কি আশ্চর্য ! স্বামীকে বাঘের মুখে, মানে, রেনীর সামনে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। পতিব্রতা বউ কোথায় প্রতিবাদ করবে ! না, প্রতিবাদ দূরস্থান, সুমিতা বললো—

'সিংজী, আপনার কিরপাণ আছে। আমাদের লাঠিও আছে। মানে, মশারী খাটানো ডাণ্ডাগুলো খুললেই লাঠির কাজ করবে। আমরা মেয়েরা বঁটি নিচ্ছি। এক জায়গায় না দাঁড়িয়ে আমরা ছাদের কোণে কোণে দাঁড়াবো—

সুমিতা, জয়শ্রী, ডোরা, গুরণাম, শীলা, অশোক, জোসেফ—সবকটা মুখ এক নজরে দেখলো অমল। কাকে কি বলবে সে ? ঘরের বউ যদি বেইমান হয়....

'কুইক !' জোসেফই বললো, 'অমলবাবু আপনি বন্দুক নিয়ে ওই ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে পোড়ো বাড়িটার পেছন দিকে যান। আমরা যে যার জায়গায় দাঁড়াচ্ছি।'

....সুতরাং এখন বীরপুরুষ অমল দাশ চলেছে বন্দুক হাতে ঝোপের ভেতর দিয়ে পোড়ো বাড়িটার দিকে। সন্ধ্যা নেমেছে। ঝোপের মধ্যে জোনাকী জ্বলছে। ঝিঁঝি পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। বুকটা ঢিপঢিপ করছে অমলের। সে রহস্যপত্রিকা, অ্যাডভেঞ্চার থ্রিলার আর কমিকস্ বড্ড পড়ে। এইটাই তার কাল হয়েছে। মনে মনে সে জানে সে হীরো নয়, অরণ্যদেবের মত দু হাতে দুটো পিস্তল নিয়ে গুলি চালিয়ে গুণ্ডার হাত থেকে পিস্তল ফেলে

দেওয়া দূরস্থান, টার্গেট প্র্যাকটিস করতে গেলে তার বন্দুকের গুলি টার্গেট ছাড়া আর সব জায়গায় বেঁধে। এখন তার মাথা ঘুরছে, কপালে ঘাম জমে গেছে, পা টলমল করছে। নিজেকে হীরো বানিয়ে গুলতাপ্পি মারতে যেয়ে এই বিপদ হবে জানলে....

ঝোপের মধ্যে কোনরকমে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে পোড়ো বাড়িটার পেছনে ইঁটের পাঁজার আড়ালে লুকালো অমল। প্ল্যানটা তার খুবই সরল। যাই হোকনা কেন, সে এখান থেকে এক ইঞ্চি নড়ছেনা। রেনী গয়নাপত্র, টাকাকড়ি, মায় সুমিতাকে যদি চুরি করে নিয়ে যায় তবুও টুঁ-ফাঁ করবেন না বীরপুরুষ! ভেতরে কারা যেন খুব উত্তেজিত ভাবে কথা বলছে। ইঁটের পাঁজার আড়াল থেকে খুব ভয়ে ভয়ে তাকালো অমল।

পোড়ো বাড়ির উঠোনে...কোঁকড়ানো চুল, লম্বা জুলফি, একমুখ দাড়ি, লম্বা দোহারা চেহারা, পরনে খাকি শার্টট্রাউজার, পায়ে হাফ-বুট ...হাতের লম্বা ছোরার ধারালো ফলাটা সিমেন্টে ঘসছে লোকটা। হ্যাঁ, রেনীই তো। রেনীর ছবি সবকটা খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল, ফোটোর মুখটা মনে আছে অমলের। পাশে ওটা কে? সবুজ ডেনিমের জ্যাকেট পেতলের তকমা আঁটা, কাঁচাপাকা চুল মাথায়—ওটা তো দারোয়ান গোপালন? তার মানে, ও রেনীর সাগরেদ্ !!

এখনও সময় আছে। রেনী, শীগগির পালাও !! তোমাকে আগে খবর দিতে পারিনি। এক বাঙ্গালী বাবু বোর্ডিং-হাউসের ঘর ভাড়া নিয়েছে। দারুণ সাহসী, বন্দুক আছে, টার্গেটে গুলি বেঁধাতে নাকি ওস্তাদ। অনেকে বলে নাকি সিক্রেটসার্ভিসের লোক....

গজগজ করে বাঙালী বাবুর মুণ্ডপাত করলো রেনী।

'এখন বোর্ডিং—হাউসে হামলা করতে গেলে তুমি আমি দুজনেই দাশসাহেবের গুলিতে মরবো—'

গজগজ করতে করতে উঠে দাঁড়ালো রেনী।

অমলের বুকটা আবার কেঁপে উঠলো।

....না, রেনী চলে যাচ্ছে! খালের ধারে, যেখানে কাঠের ভেলা ভেড়ানো আছে, সেদিকে।

আর ঝোপের ভেতর দিয়ে গুটিগুটি হোটেলের দিকে পালাচ্ছে গোপালন।

গোপালনের কথাটা পরে থানায় বলা যাবে। আপাততঃ

মনটা শক্ত করলো অমল। বীরপুরুষ হতে চায়না, স্রেফ্ বাঁচতে চায়, গুলতাপ্পি নয় !!

.. হোটেলে ফিরে সঙ্গীসাথীদের দেখেই অমল বলল —'পোড়ো বাড়িতে কেউ ছিলনা।'

খিল্‌খিল্ করে হাসলো জয়শ্রী।

বললো—'আমরা ছাদ থেকে দেখেছি, আপনি পোড়ো বাড়িতে ঢুকতেই রেনী পালালো। ওর কাঠের ভেলাটা ওখান থেকে দেখা যাচ্ছিল।'

অমলকে জড়িয়ে ধরলো জোসেফ।

'দাশসাহেব, আজ তুমি না থাকলে কি যে হতো—'

শীলা বললো—'আপনার নাম শুনেই পালিয়েছে রেনী।'

'ক্রাইস্ট, মা মেরী আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন'—ডোরা প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি!

এবার চেঁচিয়ে উঠলো অমল—

'বলছি তো কেউ ছিলনা পোড়োবাড়িতে !!'

....সুমিতা মুচকি হেসে বললো—

'যাঃ, আমরা নিজের চোখে দেখলাম, রেনী পালাচ্ছে ...তুমি আসছো দেখেই....'

[এর পরের অংশ ৬৮ পৃষ্ঠায়]

অদ্রীশ বর্ধন

"এই।"

"উঁ।"

"কি উঁ উঁ করছো।"

"তবে কি করব?"

আচ্ছা মুস্কিল তো? একটু তাকাও না।

তাকিয়েই তো আছি।

ধেৎ! আমার মুখের দিকে কে তাকাতে বলেছে। ···এ সংসারে ঐ মুখের মধ্যেই তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখতে পাই।

থাক, থাক। বাউটি চাইলাম যখন তখন কোনদিকে তাকিয়েছিলে মনে আছে?

আকাশের দিকে।

এখন সেই দিকে তাকাও।

কেন? এমন জ্যোৎস্নারাতে, এমন ফুরফুরে হাওয়ায়, এমন বসন্ত কালে গঙ্গার ধারে বসে তোমার মুখ থাকতে আকাশ দেখতে যাবো কোন দুঃখে।

আঃ! বড্ড বকো তুমি। চলে যাবে যে।

কে যাবে?

তারারা।

তারা!

দেখতে পাচ্ছো না কেমন হেলতে দুলতে রামধনুরঙ ছড়াতে ছড়াতে নেমে আসছে।

তারা আবার হেলতে দুলতে নামে নাকি। কই? কোথায়? আরে! সত্যিই তো। তারা নয় সুষমা—অন্য কিছু।

কী?

তারাবাজি মানে, হাউইয়ের রকেট।

তারাবাজি কি এদিক থেকে ওদিকে গিয়ে আবার ফিরে আসে?

তুমি দেখেছো?

নইলে তোমায় ডাকলাম কেন? সারা গ্রামটার ওপর যেন টহল দিয়ে এল। ছাখো, ছাখো, মাঠে নামছে।"

আশ্চর্য! চলোতো সুষমা দেখে আসি। মাঠেই

তো নেমে পড়েছে।

চলো।

এঘটনা ঘটল পূর্ণিমার রাতে। বিদ্যুৎ আর সুষমা নতুন বিয়ে করে গঙ্গার পাড়ে বসে দেখল আশ্চর্য একটা রামধনু গোলক এসে নামল গঙ্গার কিছু দূরেই ফাঁকা মাঠের মধ্যে। ছুটে গেল সেইদিকে। গাছ গাছালি পেরিয়ে যাওয়ার সময়ে রামধনু রঙের উজ্জ্বল তারাটা কিছুক্ষণের জন্যে চোখের আড়াল হয়েছিল। মাঠে নেমে দেখল, মাঠ ফাঁকা। কেউ কোথাও নেই। তারা মিলিয়ে গেছে। জ্যোৎস্নার আলোয় ফুটফুট করছে দিক দিগন্ত। দূরে দূরে সারি সারি নারকোলগাছগুলো যেন বিদ্রূপভরা চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে এক পায়ে ভর করে রগড় দেখছে।

গা ছমছম করে উঠল সুষমার। বিদ্যুতের হাত চেপে ধরে বললে ফিস ফিস করে—চলো পালাই।

বিদ্যুৎ পালালোনা। কৌতূহল জেগেছে। এগিয়ে গেল আন্দাজমত যেখানে ঝকঝকে তারাটা নেমেছে, সেইখানে।

ঠিক সেই সময়ে যাদের-দেখা-যায়-না, তারা তখন কথা বলছে নিজেদের মধ্যে।

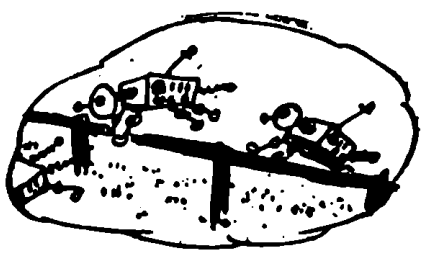

"ডিমি।"

"বলুন।"

"সবুজ গ্রহটা কদাকার, এখানকার জন্তুগুলোও দেখছি কুৎসিত।"

"তা যা বলেছেন। আকাশ থেকে দেখে ঐজন্যেই তো নেমে এলাম। দুটোকেই ধরে নিয়ে কেটেকুটে দেখতে হবে ভেতরে কি আছে।"

"ওরা কিন্তু আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। আমাদের উড়ন্ত গোলকটাকেও দেখতে পাচ্ছে না।"

"আলো ঠিকরে ছিল বলে দেখেছিল। মেশিন বন্ধ করতেই আলো মিলিয়ে গেছে। দেখতেও পাচ্ছে না।"

কিন্তু দেখতে কেন পাচ্ছে না?

সেইটা জানবার জন্যেই তো ওদের বীভৎস দেহদুটো কেটেকুটে দেখতে চাই কি আছে শরীরের মধ্যে। হাত দিতেও ঘেন্না হচ্ছে। জাল এনেছো?

"হ্যাঁ।"

ল্যাকপেকে মাত্র দুটো ঠ্যাং। জঘন্য। ঐ তো ঐটুকু মাথা—মাথার তলায় শুঁড় দুটো নাড়ছে কিরকম ছাখো।

খুবই নিম্নশ্রেণীর জন্তু। মুখ নেড়ে নেড়ে কথা বলছে দেখেছো?

তিন কোটি বছর আগে শুনেছি আমাদের গ্রহে এমনি জন্তু ছিল—মুখ নেড়ে নেড়ে আওয়াজ করতো। জঘন্য।

ওরা কিন্তু আমাদের গোলকটাকে খুঁজছে।

প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে। হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখছে।

কিরকম অবাক হয়ে গেছে দেখেছো? ইস, কি বিচ্ছিরি গর্তে ঢুকোনো চোখ। ডিমি, জাল না ফেলে ঘুমপাড়ানি গ্যাস চালাও। জন্তুদের বিশ্বাস নেই দাঁতগুলো দেখেছো কি রকম ঝকঝক করছে।

"তাই দিচ্ছি।"

প্রসঙ্গতঃ জানিয়ে রাখি, যাদের-দেখা-যায়-না তারা এই গ্রহের যে মানুষ দুটিকে কদাকার কুৎসিৎ বীভৎস

ঘৃণ্য ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করল, তাদের মত সাংঘাতিক—সুন্দর আর সুন্দরী ঐ তল্লাটে আর কেউ নেই, বিশেষ করে সুষমার মত সুন্দরী যদি পাড়া গাঁয়ে না জন্মে শহরে জন্মাতো আর বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় নামবার চান্স পেতো, তাহলে ঈর্ষায় বুক ফেটে মরে যেতো বিশ্বের সব সুন্দরী। এমন সাংঘাতিক সুন্দরীকেও কিনা কদাকার বলে গায়ে হাত পর্যন্ত দিতে চাইল না যাদের-দেখা-যায়-না তারা। বুঝুন তাদের কিরকম দেখতে! ছুটো ঠ্যাং দেখে যাদের মন ওঠে না, কখানা ঠ্যাংয়ের তারা অধিকারী, সেটাও কল্পনা করে নিন। দেখতে-টেকতে পাওয়া গেলে না হয় চোখ কটা আর শুঁড়ের ওপর বসানো কি গর্তে ঢোকানো —তাও বলা যেত। কিন্তু সে গুড়েও বালি! ব্যাটারা নিজেরাই অদৃশ্য। সুষমার পদ্মপলাশ লোচন দেখে বলে কিনা বিচ্ছিরি গর্তে ঢুকোনো চোখ! তার মানে কি এই নয় যে রাস্কেলদের চোখ গর্তে ঢুকোনো নয়? তবে কি কাঠির ডগায় বসানো? মাথাটাকে বলে ঐটুকু তবে কি ওদের মাথা জালার মতো? কে জানে!
গ্যাস দিয়ে নবদম্পতিকে অজ্ঞান করে তারা তো চম্পট দিল। গেল কোথায়?

'ডিমি, এমন জায়গাও বিচ্ছিরি এই গ্রহে আছে?"
"যা বলেছেন, চারিদিকে এত সিলিকা। সারা জীবন ধরে খেয়েও শেষ করতে পারব না। এমন জায়গা ছেড়ে জন্তুগুলো জলা জায়গায় থাকে কেন বুঝি না।"
তিনভাগই তো জল গ্রহটায়। জন্তুগুলো পালে পালে জলের ধারেই আছে দেখে এলাম। অথচ এমন সুন্দর জায়গা দেখো খাঁ খাঁ করছে।
ভালই হল। আমরা ডিমোকাইট বানিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি করে ফেলি এখানে—তারপর খবর পাঠাই আমাদের গ্রহে। ওরা আসুক দেখে যাক এমন জায়গাও আছে যাচ্ছেতাই এই গ্রহে।
অপূর্ব! সত্যিই অপূর্ব! জন্তুগুটো করছে কী?
জ্ঞান ফিরেছে। ফ্যালফ্যাল করে চারদিক তাকাচ্ছে। কি বিকট চাহনি রে বাবা!

সুষমা।
ওগো এ কোথায় এলাম আমরা?
মরুভূমি। স্বপ্ন-টপ্ন দেখছি না তো?
আশ্চর্য নয়। মাথাটা একটু ঘুরে যাচ্ছিল। তার পর তো দেখছি মরুভূমি। বিয়ে করে লোকে কাশ্মীরের স্বপ্ন দেখে, আমরা মরুভূমির স্বপ্ন দেখছি কি ব্যাপার বলোতো?
খুবই গোলমেলে ব্যাপার। মাঠের মধ্যে একটা কিছুতে হাত লেগেছিল। হাত পিছলে যাচ্ছিল—হাত বুলিয়ে বুলিয়ে শেষ খুঁজে পাচ্ছিলাম না—কিছু দেখতেও পাচ্ছিলাম না। তারপরেই মাথাটা গেল ঘুরে।
আর এখন দেখছি মরুভূমির স্বপ্ন। ভূতে পেল নাকি?
ভূত! বিশ্বাস করো?
নইলে ঝকঝকে সেই তারাটা চোখের সামনে মিলিয়ে গেল কেন?
ওটা চোখের ভুল।
তোমার মাথা। ঠানদি পই পই করে বারণ করল —ওরে এত রাতে মাঠে যাসনি—তুমি শুনলে না।
ভালইতো। ভূতে উড়িয়ে নিয়ে এল মরুভূমিতে। নিখরচায় হানিমুন হয়ে গেল।
কি যে ইয়ার্কি করো ভাল্লাগেনা—ঠানদি তো

ভাবছে।

ভাবুক—এই, এই, এই, কোথায় যাচ্ছো!

আমাকে কারা টেনে নিয়ে যাচ্ছে—ওগো, কারা ধরে নিয়ে যাচ্ছে,....চটচটে গায়ে কারা....ওগো! ওগো! ওগো!

দুম ফট করে একটা আওয়াজ হল। যাদের-দেখা-যায়-না তাদের খপ্পর থেকে সহসা নিষ্কৃতি পেয়ে ছুটে এসে বিদ্যুতের বুকে আছড়ে পড়ে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে সুষমা।

ডিমি। একি কাণ্ড! লম্বাচুলওলা জন্তুটাই দেখছি এই দুজনের মধ্যে ভয়ংকর!

আজ্ঞে হ্যাঁ, ওর মুখটাই ওর অস্ত্র। চেঁচানোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুজন কেটে গুঁড়িয়ে গেল।

"কেন এমন হল ডিমি?"

সেই জন্যেই তো লম্বা চুলওলা জন্তুটাকে কেটেকুটে দেখতে চাই। বাইরে থেকে যন্ত্রদিয়ে দেখেছি, ওদের দেহে কার্বন আছে—সিলিকা নেই—আমাদের মত।

সিলিকা দিয়ে তৈরী বলেই তো আমাদের দেখতে পাচ্ছে না ব্যাটারা। শুধু চেঁচিয়েই গুঁড়ো করে দিল দুজনকে! দেখতে পেলে না জানি কি কাণ্ডই করত! ডিমি, কি করা যায় বলো তো?

"সিলিকা তো চারপাশেই পড়ে আছ—ঝটকরে কাচের ব্লক বানিয়ে মুখটা বন্ধ করে দিন।"

তাই করো। মুখটাই যখন অস্ত্র—দাও মুখ বন্ধ করে। কী ভীষণ? কী ভীষণ! এবার চেঁচালে গোটা স্পেসশিপটাই যে গুঁড়িয়ে যাবে। বাড়ি ফিরব কি করে?

সুষমা! সুষমা! চুপ করে গেলে কেন? কথা বলছ না কেন? কি হয়েছে? অমন করে চেয়ে আছো কেন? ভয় কি এই তো আমি আছি।... কি সর্বনাশ! তোমার মুখে এটাকি! শক্ত মত হাত দিয়ে বুঝতে পারছি—কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। কাঁচের ছিপি হলেও তো দেখতে পেতাম—কিন্তু এযে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সুষমা! সুষমা!

"বেঁচে গেলাম মনে হচ্ছে এ যাত্রা—মুখ একদম বন্ধ।"

"ফার্স্টক্লাস। ডিমি, তোমায় ঐ লোকদুটো কি কি করছে?"

"কাছে সিলিকা খাচ্ছে। এমন উপাদেয় সিলিকা কোথায় পাবে বলুন।"

"সিলিকা তো ফুরিয়ে যাবে না। কিন্তু খেয়ে খেয়ে বেলুনের মত ফুলে উঠছে যে—স্পেসশিপে জায়গা হবে কি করে?"

"ডিমোকাইট দিয়ে বাড়ি ঘর দোর বানিয়ে থাকুকনা কিছুদিন।"

"আগে একটা কাজ করো।"

"বলুন।"

"ডিমোকাইট দিয়ে ঝটপট দুটো খাঁচা বানিয়ে জন্তু দুটোকে আলাদা আলাদা রাখো।"

"বুঝেছি। কাটা ছেঁড়া করতে সুবিধে হবে।"

"হ্যাঁ।"

একি! সুষমা—কোথায় যাচ্ছো—সুষমা—সুষমা!

হয়ে গেছে। দুই মক্কেলকে দুটো ঘরে আটকে রেখেছি।

খুব চটপট ডিমোকাইট বানিয়ে নিলে দেখছি। দেদার সিলিকা পেয়েছো।

[পরের অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়]

শ্রীপার্থ

ক্যারাটে কুংফু'র রাজা ব্রুস লীর নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো, তাঁর ছেলেবেলার রোমাঞ্চকর কাহিনীটি নিশ্চয়ই তোমাদের অজানা নয়! ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন ডানপিটে,অস্থির-চঞ্চল এবং ভবঘুরে। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হয়ে যান একেবারে অন্য মানুষ, ধীর, স্থির, বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান। তাঁর জীবনে আসে তখন এক অদ্ভুত গভীরতা।

এ সবেরই মূলে হলো ক্যারাটে-কুংফুর অনুশীলন, অধ্যবসায় এবং মনের একাগ্রতা। যে-কোন ব্যাপারে ঠিক মতো মনোনিবেশ করতে না পারলে সাফল্য অনিশ্চিত। তোমাদের সবারই স্কুল এখন বন্ধ, গ্রীষ্মের ছুটি। স্কুল খুললেই ষান্মাসিক পরীক্ষা। মন দিয়ে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছো তোমরা নিশ্চয়ই? হচ্ছো না! একটা কথা বলে রাখি, তোমরা সবাই যে প্রথম কিংবা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করবে, সেটা চিন্তা করা মূর্খতা। কারণ আমরা সবাই জানি সবাই ফার্স্ট বয় হলে 'লাস্ট' বয় কে হবে? যাইহোক, সেটা কোন বড় কথা নয়, লেখা-পড়ায় সবার মান এক হওয়ার কথা নয়, তবে কথা হচ্ছে, আত্মবিশ্বাসটাই সব থেকে বড় কথা এখানে। আত্মবিশ্বাস যার নেই বলতে গেলে তার কিছুই নেই, কেবল এক বুক শূন্যতা আর হাহাকার ছাড়া।

তবে সৌভাগ্যের কথা মার্শাল আর্টে তোমাদের প্রিয় আদর্শ ব্রুস লী ছিলেন আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। তাঁর সেই আত্মবিশ্বাস যেমন একদিকে তাঁকে করেছিল প্রতিষ্ঠিত, তেমনি অন্যদিকে করেছিল তাঁকে বিকশিত। তাঁর জীবনের ব্যাপ্তি সেই আত্মবিশ্বাসের সূত্র ধরেই। এই হলো ব্রুস দর্শন, ব্রুসের মতবাদ। ব্রুস তাঁর দর্শনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "মানুষের সাফল্যের মূলে হলো তার আত্ম-বিশ্বাস, তার মনের একাগ্রতা। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, নিষ্ঠা, সততা এবং একাগ্রতা, এসব না থাকলে কোন মানুষই কখনো বড় হতে পারে না। ব্রুস তাঁর মার্শাল আর্টের ছাত্র-ছাত্রীদের বলতেন, জানো, ছেলেবেলা থেকেই আমি আমার আত্ম-বিশ্বাসকে দারুণ গুরুত্ব দিয়েছি। তবে মিথ্যে বলবো না, ছেলে বেলায় কিন্তু অনেক ব্যাপারে নিজের

এই উপলব্ধিকে কাজে লাগাতে পারিনি। যাইহোক বয়সের অভিজ্ঞতায় আজ আমি এই জীবন দর্শন উপলব্ধি করেছি যে, মানুষের ব্যক্তিগত চেষ্টাই হলো সাফল্যের একমাত্র সোপান। তাই আমি তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমার কথা বিশ্বাস করে তোমাদের আত্মশক্তিকে জাগিয়ে তোলো, দেখবে তখন তোমাদের সাফল্যকে কে আটকায়!"

ব্রুসের এই মন্তব্য শুনে তোমরা হয়তো ভাবছো, প্রতিষ্ঠার শিখরে ওঠার জন্য তিনি সেই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়েছিলেন তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের। কিন্তু ব্রুস লীকে এভাবে বিচার করলে তাঁর প্রতি মস্ত বড় অবিচার করা হয়। তাঁর জীবন দর্শনকে অবজ্ঞা করা হয়।

তোমাদের বলে রাখি, ব্রুসের ছেলেবেলার জীবন ছিলো খুবই খাপছাড়া এবং ছন্নছাড়া ধরনের। প্রথম জীবনে তিনি তাঁর শক্তিকে অহেতুক অপচয় করেছিলেন।

অবশ্য কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ, সে বোঝার বয়স তখনো তাঁর হয়নি। পরবর্তীকালে 'কুংফু' এবং এবং 'গ্যাংফু' শিখতে গিয়ে তিনি বুঝেছিলেন কেবল মাত্র পুঁথিগত বিদ্যায় এসবের ওপর প্রভুত্ব করা যায় না। তার জন্য চাই দীর্ঘ অনুশীলন, গভীরে অনেক গভীরে প্রবেশ করতে হয়। আর সেই জন্য প্রয়োজন আত্ম-বিশ্বাস এবং আত্মসচেতনতা।

ব্রুস তার অধ্যবসায় দ্বারা অর্জন করা দর্শনকে কেবল নিজের জন্যই গ্রহণ করেননি, কিম্বা স্বার্থপরের মতো নিজে একা শিক্ষা লাভ করে চুপচাপ বসে থাকেননি। তাঁর এই দর্শন তিনি তাঁর ছাত্র ছাত্রী-দের মধ্যে প্রচার করে যান। মার্শাল আর্ট শেখাতে গিয়ে তিনি তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথমেই বলে দিতেন, এই মার্শাল আর্ট শেখার নয়, এ আর্ট হাতে কলমে রপ্ত করা যায় না, অনুভূতি দিয়ে বুঝতে হয়। অতএব এর থেকেই বোঝা যায় যে, ব্রুসের এই দর্শন মূলতঃ মন-নির্ভর। এবং 'কুংফু'র দর্শন আত্মস্থ না হলে এই পদ্ধতিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করা যায় না।

মনের ইচ্ছাই যে মানুষকে মহান করে তোলে, তার ব্যক্তিত্ব বাড়িয়ে দেয়, ব্রুসকে না দেখলে, বিশ্বাস হতো না আমার কখনো। জানো, ব্রুসের মনের ওপর দখল ছিলো প্রচণ্ড। তা না হলে, তাঁর মনের ওপর জোর না থাকলে, পকেটে মাত্র একশো আমেরিকান ডলার নিয়ে আমেরিকায় ভাগ্য ফেরাতে বেরিয়ে পড়েন? বলাবাহুল্য সে যাত্রা অনিশ্চিত ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না। অবশ্য আমেরিকায় গিয়ে প্রথম দিকে খুব একটা সুবিধে করতে পারেন নি। প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে লড়াই করতে হয়েছিল রীতিমতো।

ব্রুসের আমেরিকায় যাওয়ার পিছনে একটা ছোট্ট কাহিনী জড়িয়ে আছে। একবার হলো কি একটা মারপিটের ঝামেলায় পুলিস কেসে জড়িয়ে পড়লেন তিনি। ব্যাপারটা এই রকম: তাঁর কোন দোষ ছিলো না। এক ব্রিটিশ স্কুলের একদল ছাত্র গায়ে পড়ে তাঁর সঙ্গে প্রথমে ঝগড়া বাধায়। তারপর ঝগড়া করতে করতে হঠাৎ ব্রুসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা। ব্রুস তখন একা। একা হলে হবে কি, তিনি তাঁর অবিশ্বাস্য শারীরিক ক্ষিপ্রতা ও শক্তি দিয়ে তাদের ঘায়েল করে ফেলেন। তখন 'উইং-চু' স্টাইল ব্রুসের সম্পূর্ণ আয়ত্তে এসে গিয়েছিল! ক্ষিপ্রগতিতে সে এক অবিশ্বাস্য ভঙ্গিমায় তিনি পা দু'টিকে ব্যবহার করে ছেলেদের শুধু ঘায়েলই

করলেন না, তাদের মধ্যে একজনকে সপাটে এমন ঘুষি মারলেন যে, তার দুটি তাজা দাঁত সঙ্গে সঙ্গে মাড়ি থেকে খসে পড়লো। তারপর যথারীতি পুলিসের কাছে রিপোর্ট গেলো ব্রুসের নামে। গ্রেপ্তার হলেন তিনি। ওদিকে ব্রুসের মা মিসেস লী সেই দুঃসংবাদটি পাওয়া মাত্র উদ্বিগ্ন হয়ে থানায় ছুটলেন ছেলেকে জামিনে খালাস করে আনার জন্য। এরপর মিসেস গ্রেস লী দারুণ ভেঙ্গে পড়লেন ছেলের চিন্তায়। সেই অপ্রিয় ঘটনার পর তিনি ধরেই নিলেন যে, ব্রুস হংকং-এ থাকলে তার লেখা-পড়া কিস্সু হবে না, গোল্লায় যাবেন তিনি। তাই ছেলেকে আমেরিকায় পাঠানোর জন্য জোর তাগিদ দিলেন তিনি তার স্বামীকে। যাইহোক, অনেক ভাবনা-চিন্তার পর মিঃ লী ঠিক করলেন, ব্রুসকে সান ফ্রান্সিসকোয় পাঠাবেন।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনি তাঁর সেই ভাবনার রূপ দিলেন।

—০—

আশ্চর্য তারা [৫৪ পৃষ্ঠার পর]

ওরা এই সিলিকাকে বালি বলে।

কি করে বুঝলে ?

লম্বাচুলওলা জন্তুটা মনে মনে খুব জোর কথা বলছে যে। মুখবন্ধ। কি করবে বলুন। বলছে, ওর মুখের মধ্যে বালি ঢুকে গেছে।

তাড়াতাড়িতে ডিমোকাইট বানাতে গিয়ে কিছু সিলিকা হয়ত মুখে ঢুকে গেছে।

আজ্ঞে।

ঢুকুগ গে। তোমার কাজ আরম্ভ কর।

আগে লম্বাচুলওলা জন্তুটার গায়ের খোলসগুলো ছাড়িয়ে ফেলি।

নিশ্চয়। নইলে কাটাকুটি করবে কি করে। ছোট চুলওলা জন্তুটা কাছে আসতে পারছে না- দূর থেকে কিরকম দেখছে—

কিন্তু আরকেটার মুখ নড়ছে। ওরা দেখতে পাচ্ছে না, যদি ওটা কোনরকম গণ্ডগোল করে বসে। দরকার নেই এবার ওদের ছেড়ে দিয়ে আসি। হাতে সময় অল্প। ভীষণ বিরক্ত হয়ে, ও-দের নামিয়ে দেখি কি করে ?

একটু পরেই একটা প্রায়-অশ্রুত অদ্ভুত শব্দ শুনলাম এবং তীব্র একটা আলোর ঝলক দেখলাম। এর পরের ঘটনা।

হটাৎ এক ঝটকায় খুলে গেল সিলিকা।

সুষমা কথা বলল। একি ! আমরা কোথায় এলাম ! দীঘার সমুদ্র পারে। তবে এটা কি করে হলো ! আমাদের গ্রাম দীঘার থেকে অনেক দূরে কে এনে ছেড়ে পালিয়েছে !

বুঝচো কে ? উড়ন্ত গোলকটা আর দেখতে পাচ্ছ কি সুষমা !

এখন তা জানা গেল তো ?

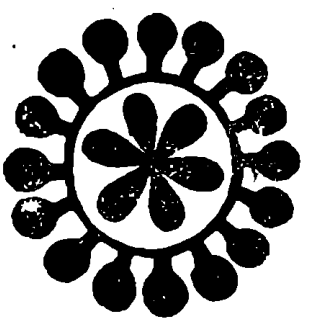

শয়তান ও টারজান | অভিক মিত্র

শয়তান ও টারজান

[চলবে]

গ্রেট ব্রিটেনের প্রস্তর যুগের মানুষ

ডঃ সুপ্তি সেন

কয়েক হাজার বছর আগে গ্রেট ব্রিটেনের চেহারা কেমন ছিল কল্পনা করতে পারো? এখন যে সুন্দর দ্বীপগুলো আছে সেগুলো মোটেই সুন্দর ছিল না। এমন কি দ্বীপই ছিল না সেইগুলো। ইংল্যাণ্ড তখন ফ্রান্সের সঙ্গে যুক্ত ছিল, কারণ সমুদ্র ছিল না মাঝখানে।

কিন্তু সেই সুদূর অতীতে সেই মাটিও এমন সবুজ শস্যশ্যামল ছিল না, ছিল বরফে ঢাকা।

আস্তে আস্তে একদিন আবহাওয়া হয়ে এল উষ্ণতর। বরফ গেল গলে, বেরিয়ে পড়ল রুক্ষ পাথর। ফুল বা ফলের চিহ্নও তাতে নেই।

তারপর ধীরে ধীরে জন্মাল গাছপালা, এলো মানুষ। এই আদিম মানুষদের দেখলে মানুষ বলে হয়তো মনেই হবে, না, গায়ে পশুর মত লোম, মুখে হিংস্র জান্তব ভাব।

কিন্তু এইসব লোকেরা অল্পবিস্তর কথা কইতে জানত।

জন্তুর চামড়ার কাপড় তৈরি করে পরত, এমন কি ছোট ছোট পরিবারেও তারা থাকত।

তবে তখনও তারা বাড়ি তৈরি করতে শেখেনি। শীত কিংবা পশুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা ভারী শক্ত ছিল তাদের পক্ষে।

ডেভনের কাছাকাছি টর্‌কে বলে একটা জায়গায় কেণ্টের গুহা বলে একটা গুহা আছে। দশহাজার বছর আগেও এখানে মানুষ বাস করেছে। এরকম বহু প্রাচীন গুহা ইংল্যাণ্ড ও ইওরোপে আছে। ফ্রান্সদেশে এইরকম কতগুলি গুহার দেওয়ালে হরিণ ঘোড়া ইত্যাদি জন্তুর ছবি আছে। ছবিগুলো বেশ পরিণত ও সুন্দর। তবে অক্ষর তখনও আবিষ্কৃত হয় নি।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল এরা আগুন জ্বালতে জানত, আর রান্নাকরা খাবার খেত। এরা ছিল পুরোপুরি প্রস্তরযুগের মানুষ, কারণ লোহা বা ধাতুর কোন ব্যবহার এরা জানত না। এদের বর্শা আর অস্ত্রশস্ত্র সবই ছিল পাথরের তৈরী। মাটির তৈরী পাত্রও এরা ব্যবহার করেনি কোনদিন।

এই পাথরের অস্ত্র দিয়ে এই আদিম মানুষেরা যুঝত ভয়ানক সব জন্তু জানোয়রের সঙ্গে, যাদের অনেকেই আজ পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তার মধ্যে ছিল ম্যামথ অর্থাৎ অতিকায় হাতী, গুহা ভল্লুক, রোমশ গণ্ডার। বর্শা ছাড়া এদের আর একটি বিচিত্র অস্ত্র ছিল, যার নাম হচ্ছে বোলাস। চামড়ার দীর্ঘ সুতোয় বাঁধা থাকত এক টুকরো পাথর। এই সুতো ছুড়ে শিকারকে ধরাশায়ী করত এরা, তারপরে বর্শা দিয়ে তাকে মেরে ফেলত।

এরপরে আজ থেকে ছয় সাত হাজার বছর আগে ইংল্যাণ্ডে এল নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ, একই পথ দিয়ে হেঁটে হেঁটে। এরা সভ্যতায় আরও কিছুটা এগিয়ে গেছে।

পশুর চামড়া পরলেও এরা কিন্তু এতদিনে তীর-ধনুক ব্যবহার করতে শিখে গেছে। এদের বুদ্ধিবৃত্তি উন্নত, মগজ অনেক পরিষ্কার।

ইংল্যাণ্ডে এসে এরা দেখল অবশ্যই আজকের এই সুন্দর রাস্তা কিংবা বাড়িগুলো নয়। জলা আর বনজঙ্গলে ভরা একটা দেশ দেখতে পেল এরা, যার ধারে খড়িমাটির ছোট ছোট পাহাড়। এই শুকনো খড়িপাহাড়ের অঞ্চলেই বসবাস করত বেশী লোক। এখানেই এদের সভ্যতার চিহ্ন কিছু কিছু রয়ে গেছে।

তখন এরা কী ভাষা বলত, কী নামে নিজেদের ডাকত, আমরা জানিনে। মনে মনে একটা গল্প ছকে নেওয়া যাক।

মনে করা যাক একজন লোক খুব তাড়াতাড়ি দৌড়াতে পারত। তাকে তার সঙ্গীরা ডাকত দৌড়নোয় ওস্তাদ বলে। সে হয়ত গুহায় থাকতে আর চাইল না। তার বুদ্ধি অন্যদের চেয়ে বেশী বলে সেই প্রথম আবিষ্কার করল বাড়ি। পাথর দিয়ে গাঁথল দেওয়াল, ডালপালা আর ঘাসের ছাউনি দিয়ে বানাল ছাত। বৃষ্টি আর বরফপাত থেকে বেঁচে গেল সে।

পাথর ঘষে ঘষে সরু সূক্ষ্ম আকার দিয়ে তীর তৈরি করত এই সব নতুন মানুষ। পশুর চামড়া কেটে সুন্দর জামাকাপড়ও বানাতো। এরা আবার সেই সব জামাকাপড় সেলাইও করত হাড়ের তৈরী ছুঁচ আর সরু চামড়ার সুতো দিয়ে। এই ওস্তাদ লোকটা ভেবে ভেবে একদিন মাছ ধরবার ছিপও বানিয়ে ফেল্‌ল হাড়ের ছুঁচের। আগায় একটা হুক লাগিয়ে।

তারপর বানাল কাঠের গুড়ির ভেলা, নদী নালা

পার হবার জন্যে।

এতদিন প্রস্তর যুগের মানুষ এক কুকুর ছাড়া আর কোন জীব জন্তুর সাহায্য নেয় নি। কুকুর অবশ্য তারা ব্যবহার করত শিকারের কাজে। কিন্তু এই নতুন মানুষেরা তাদের সঙ্গে এনেছিল দলে দলে ছাগল, গরু, ভেড়া এবং শূয়োর। তাই পশুর মাংসের জন্যে সবসময়ে শিকারে বেরোতে হত না তাদের, বাড়িতেই পেয়ে যেত গৃহপালিত জন্তুর মাংস।

এর পরে কালক্রমে এরাই আবিষ্কার করে ফেলল কৃষিবিদ্যা। সেও এক অদ্ভুত ব্যাপার। কেমন করে যে চাষবাস আরম্ভ হল সেটা কল্পনা করা যাক।

ওস্তাদের স্ত্রী বা অন্য কোন মেয়ে হয়তো কিছু ঘাসের বীচি অন্যমনস্ক হয়ে মাটিতে ছড়িয়ে ফেলে দিল। হঠাৎ দেখা গেল বীজ থেকে গাছ জন্মেছে। এই বীজ কবরস্থানটির উপর গড়ে তুলত মাটির ঢিপি। এই সমস্ত বেদী এখনও দেখা যায় ব্রিটেনে।

এবারে একটা বিচিত্র জিনিসের কথা বলছি, যার নাম হল 'স্টোনহেঞ্জ'। সেযুগে মানুষ ছিল সূর্যোপাসক। সূর্যপূজার জন্যে তারা তৈরি করেছিল বিরাট বিরাট প্রস্তর চক্র। বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে উৎসব করতে মিলিত হত সেইসব জায়গায়। এইরকম একটি উপাসনার স্থানে আছে এই 'স্টোনহেঞ্জ' অর্থাৎ সূর্যদেবের মন্দির। এই মন্দিরটি হল উইল্টশায়ার-এর স্যালিসবেরী প্লেনে। মনে হয় শতশত লোক এই মন্দির তৈরির কাজে লেগেছিল কেন না বিরাট বিরাট পাথর টেনে আনা হয়েছিল বহুদূর থেকে। ওয়েলসের বিভিন্ন পাথুরে জায়গা থেকে পাহাড় কাটিয়ে টেনে আনা হয়েছিল এই পাথর।

ঠিক জানি না কী কায়দায় কাটানো হয়েছিল পাথর। তবে দীর্ঘ দিন ধরে ঠুকে ঠুকে অসমান পাথর মসৃণ করা হয়েছিল সযত্নে। শক্ত গাছের গুঁড়ির সাহায্যে জলের উপর ভাসিয়েও আনা হয়েছিল পাথরগুলি। তারপরে এলো পাথরগুলোকে খাড়া করে দাঁড় করানোর সমস্যা। এখনকার দিন হলে বিশালকায় ক্রেনের দরকার হত এই কাজে। তখন তো আর ক্রেন ছিল না। একদিকে মাটি উঁচু আর অন্য দিকে গর্ত করে গড়িয়ে ফেলা হয়েছিল পাথর, এছাড়া আর উপায় কী।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, এই চার হাজার বছরে এক-চুলও নড়েনি সেই সব প্রকাণ্ড আকারের প্রস্তরখণ্ড।

ঘাসের বীজ বা বীচি সিদ্ধ করে একদিন খেতে শিখল এরা। আবার একদিন এই বীচি গুড়ো করে রুটিও তৈরী করে ফেলল। তারপর এই রকম গুড়ো করার প্রয়োজনে পাথরে গর্ত করে তৈরী হল একধরনের আদিম জাঁতা।

এবার, বুঝতেই পারছ মানুষ আস্তে আস্তে সভ্য হয়ে আসছে।

আর তারা দেশে দেশে জীবজন্তু নিয়ে ঘুরে বেড়ায় না। ছোট ছোট কুঁটিরে বাস করে, চাষের জন্য বানায় ছোটখাট খামার।

আর একটা জিনিস শিখে গেছে এরা যেটা তাদের সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে অনেকদূর। সে হল মাটির বাসন তৈরি করা।

এই যুগে তৈরী মাটির থালাবাটি সত্যি সত্যি পাওয়া গেছে। আমাদের বাসনপত্রের পালিশ আর মসৃণতা অবশ্য তাতে নেই। সবচেয়ে মজার ব্যাপার কী জানো? এইসব বাটি বা বাসন টেবিলের উপরে রাখবার জন্য তৈরী হয় নি। কেন না এদের তলাটা

[এর পরের অংশ ৭১ পৃষ্ঠায়]

লোক দেখা গেল তারা খুবই গরিব, খেটে খাওয়া মানুষ।

রঞ্জু কি বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ লাফিয়ে উঠল।—সরে আয় কুকুর।

বাপ্পা দেখল একটা রোগা পটকা হাড় জিরজিরে কুকুর তাদের পিছু পিছু আসছে। কুকুরটা নিতান্ত বাচ্ছা নয়, আবার বড়োও নয়। কিন্তু চেহারা দেখলে ভয় করে। এত রোগা যে মনে হয়, সত্যি করে কুকুর নয়, কুকুরের প্রেতাত্মা। তাছাড়া রঙটাও কুচকুচে কালো। অত কালো কুকুর ওরা কখনো দেখেনি। কুকুরটা খিদেয় ধুঁকছে। আর চোখ দুটো যেন ধক্ ধক্ করে জ্বলছে।

ব্যস! বাপ্পার মন অমনি গলে গেল।

—আয়, তু: !

এসব দেশের বেশির ভাগ মানুষই বাংলা বোঝে না। কিন্তু আশ্চর্য কুকুরটা দিব্যি বুঝল। আর সঙ্গে সঙ্গে বাপ্পার কাছে এসে ল্যাজ নাড়তে লাগল।

—কুকুরটা অনেক দিন খেতে পায়নি। বাপ্পা বলে। পকেট থেকে প্লাস্টিকে মোড়া একটা ঠোঙা বের করে একটা বিস্কুট ছুঁড়ে দিল। এখানে পর পর দুটো তিনটে দোকান রয়েছে। দোকানের লোক গুলোর শুধু কালো কালো চেহারাই নয়, দেখতেও ভয়ংকর। তাদের দুজনকে দেখে একজন দোকানদার বোধ হয় অবাক হল। তারপর নিজেদের মধ্যে দুর্বোধ্য ভাষায় কি বলাবলি করল। আশ্চর্য, একটা সিগারেটের ছোট্ট দোকানে কয়েকটা সুন্দর সুন্দর জামার কাপড়ের থানও ঝুলছে। রঞ্জু বললে ভারি সুন্দর শার্টিংতো। চ' দেখি।

বাপ্পা ইতস্তত করল।—সঙ্গে টাকা নেই। যখন কিনবি না তখন শুধু শুধু দেখে লাভ?

—না কিনলে বুঝি দেখতে নেই?

ওদের দেখে দোকানদার হাতের ইশারায় ডাকল। রঞ্জুতো হুড়মুড় করে এগিয়ে গেল। বাপ্পা গেল পিছু পিছু।

দোকানদার খুব যত্ন করে শার্টিংগুলো দেখালো। ফিস্ ফিস্ করে বলল, ইম্পোরটেড্ গুড্স্।

তা তো বটেই। নইলে এত ভালো কাপড়?

—কত করে মিটার? How much?

—থার্টি রুপিস্।

রঞ্জুর দু'চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল। কিনতে খুব ইচ্ছে করছে, কিন্তু সঙ্গে টাকা নেই।

এদিকে পাশের দোকানের দুটো লোক চুপি চুপি এসে পড়েছে রঞ্জু লক্ষ্য করেনি। কিন্তু বাপ্পা ঠিক খেয়াল করেছে। সে লুকিয়ে রঞ্জুর গায়ে একটা চিমটি কাটল। অর্থাৎ সাবধান। দর করিস না। দর করলেই নিতে হবে। রঞ্জু ইশারা বুঝল। আর দরদস্তুর না করে দোকান থেকে রাস্তায় নামল। কিন্তু জনা তিনেক লোক তাদের দিকে তাকিয়েই রইল। বাপ্পা বললে, পা চালা।

—শার্টের কাপড়গুলো কিন্তু ভালো ছিল। ঐ পিঙ্ক কালারটা—ওবেলা টাকা নিয়ে আসব।

বাপ্পা কোনো উত্তর দিল না।

হঠাৎ ওদের কানে এল দোকানদারটা ওদের চেঁচিয়ে ডাকছে।

দুজনেই থম্‌কে দাঁড়াল। রঞ্জু বললে, ওরা ডাকছে যে।

বাপ্পার মুখ গম্ভীর। একটু ভেবে বললে, ডাকছে যখন শুনতেই হবে। কিন্তু ওরা বড়ো dangerous স্মাগলার তো—।

ওরা দুজনে আবার ফিরল।

কাছে যেতেই চায়ের দোকানের ঢ্যাঙা লোকটা —যার চোখ দুটো লাল, পরনে লুঙ্গি—ইংরেজি আর

হিন্দি মিলিয়ে বললে, না হয় দুটো টাকা কম দিয়ে জিনিসটা নিয়ে যাও।

রঞ্জু বললে, কিনতাম। কিন্তু no money.

—তোমরা কোথা থেকে আসছ।

আর এক জন জিজ্ঞেস করল।

বাপ্পা বলল, আমরা টুরিস্ট। স্টেশনে আমাদের বগি রয়েছে। আমরা গ্রাম দেখতে বেরিয়েছি।

ওরা মন দিয়ে শুনল। তারপর একজন বললে, তোমাদের টাকা নেই। টাকা চাও? service? নক্‌রি—নক্‌রি?

বাপ্পা বললে, আমরা এখন স্টুডেণ্ট। এখন নক্‌রি করব না।

একথা শুনে ওরা নিজেদের মধ্যে একটু হাসাহাসি করল। তারপর লম্বা লোকটা বললে, ঠিক আছে। ওবেলা টাকা নিয়ে এসো। আরো ভালো শার্টিং দেখাব।

রঞ্জুর চোখ জ্বল জ্বল করে করে উঠল।—আরো ভালো?

—হ্যাঁ, Yes, better quality. তবে এখানে পাবে না। আমাদের স্টোরে নিয়ে যাব।

রঞ্জু খুশী হয়ে বললে, O. K.

—আসবে তো? তোমাদের কুড়ি টাকা মিটারেই দিয়ে দেব।

রঞ্জু বললে, হ্যাঁ নিশ্চয় আসব।

আর ঘোরা হল না। বেলা তখন বারোটা বাজে। নাওয়া খাওয়ার সময় হয়েছে। ওরা স্টেশনে ফিরে এল। সারা পথ বাপ্পা খুব গম্ভীর। একটি কথাও বলল না।

প্ল্যাটফর্মে এসে বগিতে উঠতে যাবে হঠাৎ ওরা দেখে সেই কালো কুকুরটা কখন তাদের পিছু পিছু এসে ল্যাজ নাড়ছে। বাপ্পা আর একটা বিস্কুট দিল। তারপর খাওয়া হয়ে গেলে যখন দেখল কুকুরটা তখনো প্ল্যাটফর্মে বসে ওদের বগির দিকে হাঁ করে চেয়ে রয়েছে তখন নিজের পাতের এঁটো ভাত মাংস কুকুরটাকে খেতে দিল। কুকুরটা যে ভাবে হাঁউ হাঁউ করে এক নিশ্বাসে ভাতগুলো খেয়ে ফেলল তাতে মনে হল বেচারি অনেক দিন খেতে পায় নি। আহা রে..... !

বেলা তখন প্রায় আড়াইটে। খাওয়া দাওয়া সেরে সবাই ঘুমোচ্ছে।

বাপ্পা আর রঞ্জু দুজনে দুটো বাঙ্ক দখল করে ডিটেক্‌টিভ বই পড়ছে। নিশ্বাস ফেলবার সময়টুকুও নেই। এমন সময়ে হঠাৎ নিস্তব্ধ প্ল্যাটফর্মে কুকুর ডেকে উঠল ঘেউ ঘেউ।

বাপ্পা আর রঞ্জু চড়াত করে লাফিয়ে পড়ল বাঙ্ক থেকে। তারপরই এক দৌড়ে দরজায়। কুকুরটা তখনো প্ল্যাটফর্মের পিছনের দিকে কোনো এক অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশ্যে একটানা ঘেউ—ঘে—উ করে চেঁচিয়েই যাচ্ছে।

—ঐ দ্যাখ, বাপ্পা, একজন লোক—কাঁধে কয়েক খান কাপড়—ঐ দ্যাখ পালাচ্ছে।

—আরে! লোকটা যেন সকালের সেই লোকটা—! বাপ্পা লাফ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামল। ওকে দেখেই কুকুরটা চিৎকার থামিয়ে কুঁই কুঁই করতে লাগল।

—লোকটা বোধ হয় আমাদের কাছেই শার্টিং বেচতে এসেছিল। হতভাগা কুকুরটা শুধু শুধু তাড়ালো, রঞ্জু বিরক্ত হয়ে বলল।

বাপ্পা তখনই কোনো উত্তর দিল না। যতক্ষণ সেই পলাতক লোকটাকে দেখা যায় দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে বললে, তুই কি সত্যি সত্যি বিকেলে শার্টের কাপড় কিনতে যাবি?

—বাঃ, যাব না? সেই লোকটা বললে না আরো

ভালো কাপড় কোথায় আছে দেখাতে নিয়ে যাবে ?
বাপ্পা একটু চুপ করে থেকে বললে, বাবা মাকে সব ব্যাপারটা জানিয়ে যাস।
—সেতো যেতেই হবে। নইলে টাকা পাব কি করে ?
বাপ্পা একটু লজ্জা পেল। তাই তো।
—তুই কি কিছু ভাবছিস ?
—নাঃ। বলে বই মুড়ে পাশ ফিরে শুলো।
বিকেলে জোর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। তারপর ওরা বেরোতে গেলে রঞ্জুর মা বাবা বারণ করলেন। বললেন, অজানা অচেনা জায়গা তার ওপর বৃষ্টি বাদল কী দরকার জামার কাপড় কিনতে যাওয়ার ? কিন্তু রঞ্জু শুনল না। বললে এই তো কাছেই দোকান। এখুনি চলে আসব।
বাপ্পা কিন্তু চুপ। যাবার জন্যে জেদও ধরল না, যাবনাও বলল না। স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটু গিয়েই বাপ্পা বলল, তোর কাছে একটু কাগজ আছে ?
রঞ্জু বললে, না তো, কাগজ কি হবে ?
—আচ্ছা, তুই একটু দাঁড়া। বলে বাপ্পা এক ছুটে গাড়িতে ফিরে এসে খাতার পাতা ছিঁড়ে তাড়াতাড়ি একটা নক্সা আঁকল।
স্টেশন। তীর চিহ্ন দিয়ে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ, দক্ষিণে কাঁচা রাস্তাটা তীর চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিল। তারপর গাছের নীচে টিনের ছাউনির দোকানগুলো। একটাতে দেখালো কাপড় ঝুলছে। তারপর কাগজটা মুড়ে চলে এল প্ল্যাটফর্মের কোণে যেখানে ঠাকুররা রান্না করছিল। হেড ঠাকুরের সঙ্গে বাপ্পার বেশ ভাব। তাকে চুপি চুপি বললে আমরা বিদেশী জামার কাপড় কিনতে যাচ্ছি। যদি শোন রাত আটটা পর্যন্ত ফিরিনি তাহলে এটা বাবাকে দিয়ো।
ঠাকুর পান চিবুতে চিবুতে বললে, ফিরতে দেরি কোরোনা খোকাবাবু। নটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া শেষ করতে হবে। দশটায় গাড়ি ছেড়ে যাবে। বলে চিরকুটটা ট্যাকে গুঁজে রাখল।
বাপ্পা রঞ্জুকে কিছু বলল না। দুজনে তাড়াতাড়ি দোকানগুলোর দিকে হাঁটতে লাগল।
—ওরা যে কুড়ি টাকা মিটার নেবে মাকে তা বলিনি। বলোছ তিরিশটাকাই। রঞ্জু ফিক করে হাসল। —এ মিথ্যেতে দোষ নেই কি বলিস ?
বাপ্পা উত্তর দিল না।
—আমার কিন্তু পিংক কালারটাই বেশি পছন্দ। রঞ্জু তাকালো বাপ্পার দিকে।
বাপ্পা কিছু বলল না। বড্ড গম্ভীর হয়ে আছে।
—কি এত ভাবছিস বল্‌তো।
—ভাবছি, লোকগুলো ওবেলা হঠাৎ চাকরি করার কথা বলল কেন ?
—এতো সোজা কথা। পৃথিবী সুদ্ধ লোকে জানে বাঙালিরা খুব ইনটেলিজেন্ট।
উত্তরটা যে বাপ্পার মনঃপুত হল না তা ওর মুখ দেখেই বোঝা গেল।
—কিন্তু আমাদের যে চাকরির বয়েস হয়নি তা তো ওরা বোঝে।
বাপ্পা একটু থেমে যেন নিজের মনেই বললে, তাহলে এমন চাকরি যা আমাদের বয়সী ছেলেদের জন্যেই।
—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। রঞ্জু সায় দিল।
—কি সে চাকরি ? বাড়ির চাকর কিম্বা দোকানের সেল্‌সম্যান।
রঞ্জু মুখ কুঁচকে বললে, এ ম্যা, এমন কথা ওরা ভাবল কি করে ? আমরা টুরিস্ট। আমরা করব কিনা দোকানের কাজ।

[এর পরের অংশ ৬৯ পৃষ্ঠায়]

বিস্ময়কর গুণিন (৪৪ পৃষ্ঠার পরের অংশ)

রোমাঞ্চিত দেহে সে দিকে তাকিয়ে রইলেন। হায়নার দুটি চোখ অন্ধকারে জ্বলছে—আর তার পেছনে আরো বহু আলো জ্বলছে, হয়ত আকাশের তারা।

ইম-ইস-লা-আকবর হুম—মন্ত্র পড়ে চলেছে জনু। একসময় গুটি গুটি পায়ে হায়নাটি এগিয়ে এসে ঘরে ঢুকলো। অতঃপর জনুর হাত থেকে একটা হাড় সুদ্ধ মাংস নিয়ে ধীরে ধীরে ফের বাইরে চলে গেল।

মন্ত্র তেমনি চলছে। আবার দেখা গেল আরেকটি ছায়ামূর্তি—আরেকটি হায়না। দরজার কাছে এসে সেটা সামান্য ইতস্ততঃ করলো, তারপর গুটি গুটি ঘরে ঢুকে জনুর হাত থেকে মাংস নিল। জনু সস্নেহে ওটার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিল। দ্বিতীয় হায়না ফিরে গেল।

ফের দেখা দিল……ঘরের এক কোনে টিমটিমে কালিপড়া একটা লণ্ঠন জ্বলছে বটে, তাতে আলোর চেয়ে ভূতুড়ে অন্ধকারই বাড়িয়েছে বেশি।

মন্ত্রপাঠেরও কামাই নেই—আরও ঐ কুৎসিৎ দর্শন হিংস্র জীব হায়নাদের আসারও কামাই নেই। অগণিত হায়নার এক মিছিল যেন নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে চলেছে।

সাহেব-মেম বিশেষ করে মেম-এর অবস্থা ভয়ে আশংকায় হল আধমরা। ফিসফিসিয়ে মেম এবার কানে কানে বললেন, এনাফ্ অফ ইট। আর নয়, চল এবার যথেষ্ট হয়েছে। মারাত্মক অভিজ্ঞতা।

এই অলৌকিক ভয়াল কাণ্ড দেখে সাহেবের অবস্থাও কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তাঁর শরীর ত্রাসে তখন মৃদু মৃদু কাঁপছিল।

একটির পর একটি প্রায় তিরিশ-চল্লিশটা হায়না এই ভাবে মন্ত্র বলে কিংবা কোন আধিভৌতিক গুণে ধীর পায়ে এসে ঘরে ঢুকে জনুর হাত থেকে মাংস নিয়ে চলে যেতে লাগলো।

এক সময় এই দুঃসহনীয় অস্বস্তিকর অবস্থা শেষ হল।

দরজার বাইরেকার অসংখ্য জলন্ত চোখ ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে গেল। জনু উঠে সাহেব মেমকে নিয়ে জিপ পর্যন্ত তাঁদের পৌঁছে দিল।

সাহেবের মুক্তহস্ত বখশিস পেয়ে জনু সকৃতজ্ঞ সেলাম করলো।

অতঃপর সাহেব মেম ফিরে গেছেন বিলেতে তাদের নির্বিঘ্ন নিরাপত্তায়—কিন্তু বাকি জীবন বুঝি তারা, বিশেষ করে মেম, ঘুমের মধ্যেও আদ্দিস আবাবার শহরতলীর জনু ফকিরের কুটিরে বসা সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে চমকে জেগে উঠতেন।

—০—

ভয়ঙ্কর সেই রাত (৪৬ পৃষ্ঠার পরের অংশ)

যাকে একবার শিকার করে জলের তলায় নিয়ে যায় সে আবার ফিরে এসেছে এমন ঘটনা শোনা যায় নি। তাই কুসংস্কারবশে গাঁয়ের লোকে ভাবল মৃত ছেলেটির প্রেতাত্মা তাদের ভয় দেখাবার জন্য ফিরে এসেছে। শয়তান কুমীরটা ওই আত্মাকে বমি করে পেট থেকে বের করে দিয়েছে। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, ওর আত্মা বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনকে কুটিরের নিরাপদ আশ্রয় থেকে নদীতে ডেকে আনতে প্রলুব্ধ করবে, ফলে তারাও ওই শয়তানটার শিকার হবে।

সাহায্যের জন্য কেউ এগিয়ে না আসায় ছেলেটি গড়িয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে গাঁয়ের মধ্যে এসে পড়ল। প্রচুর রক্তপাতে, দুর্বলতায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ও।

কুমীরের খোঁয়াড়ে থাকার সময় ওর মাথা থেকে পা কাদায় ভরে গিয়েছিল, এখন তা শুকিয়ে ওর কালো চামড়ার ওপর একটা ধূসর আস্তরণ সৃষ্টি হয়েছে। ঝলমলে চাঁদের আলোয় ওকে ঠিক ভূতের মতই দেখাচ্ছে। গাঁয়ের অসম সাহসী কেউ কেউ কুটিরের ছিদ্র দিয়ে ওকে ওই অবস্থায় দেখে তাই ভাবল। তাদের মনে বদ্ধমূল ধারণা হল যে, ছেলেটির অশুভ আত্মা তাদের ক্ষতি করতে এসেছে। ফলে তারা নিজেদের কুটিরে অবরোধ গড়ে তুলল যাতে অশুভ আত্মার অনুপ্রবেশ ঘটতে না পারে। এমনকি নিজের কুটিরের দরজায় বারবার করাঘাত করা সত্ত্বেও ওর নিজের আত্মীয় স্বজনও ভয়ে দরজা খুলল না।

ছেলেটি বলতে চেষ্টা করল যে, কুমীরের হাত থেকে ও পালিয়ে এসেছে, ভূত নয়, কিন্তু গুছিয়ে কথা বলার মত মনের অবস্থা তখন ওর ছিল না। শেষ পর্যন্ত মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ছেলেটি—আহত, ক্ষত বিক্ষত, রক্তাক্ত, একটি জোয়ান ছেলে শ্রান্তির কোলে ঢলে পড়ল।

কয়েক ঘণ্টা পরে যখন সূর্য উঠল, তখন ওর মৃতদেহটা নিজেদের বাড়ির সামনে পথের ধূলোর ওপর পড়ে আছে। তখন কিন্তু সরল গ্রাম্য মানুষগুলো বুঝতে পারল তাদের ভুল, সে ভুলের মাশুল দিল একটি তাজা জীবন।

কি মজাই মজা!

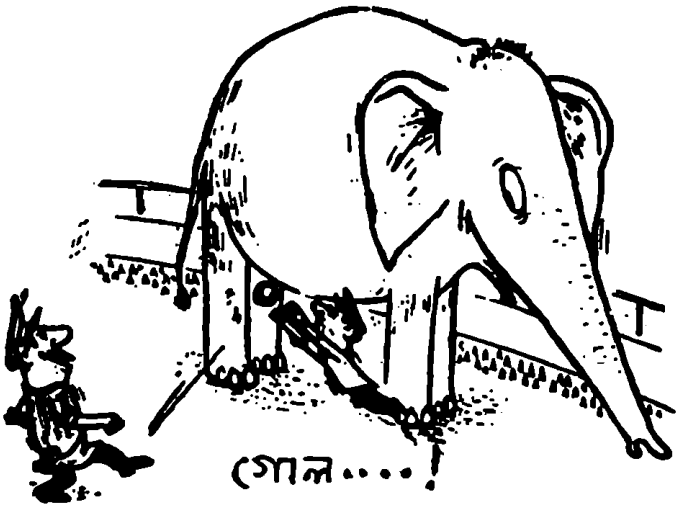

হাতির পায়ের নিচে পিকু বল খেলছে।
রেফারী বাঁশী নিয়ে প্রস্তুত।

বেড়াল ভায়া কি শুনছো?....
ট্রানজিষ্টারে ম্যাও....ম্যাও!

**বীরপুরুষ (৫০ পৃষ্ঠার পরের অংশ)

'আমি আসছি দেখে রেনী পালাবে কেন?' আরও জোরে চেঁচালো অমল, 'রেনীর ভয়ে আমারই বুক ধড়ফড় করছিল, পা কাঁপছিল। হ্যাঁ, আপনারা সবাই শুনে রাখুন, আমি বীরপুরুষ নই, আমি যেসব গল্প আপনাদের শুনিয়েছি, সব বানানো....'

....শেষ কথাটা কিন্তু বললো মুখরা জয়শ্রী—
'সুমিতা, তোমার হাজব্যাণ্ড বড্ডো বিনয়ী...বিনয় দেখাতে যেয়ে কেমন গুল মারছে ছাখো!'

[৬৬ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

—Here is the point. বাপ্পা বলল।

—তবে কেন ওরা চাকরির লোভ দেখালো ?

রঞ্জু ভেবে বলল, হয়তো ওদের জানাশোনা কারো বড়ো অফিস আছে। সেখানে অ্যাপ্রেন্টিস —

—তুই একটা বুদ্ধু ! এই অজ পাড়াগাঁয়ে বড়ো অফিস !

রঞ্জু লজ্জা পেয়ে বলল, এখানে কেন ? ম্যাড্রাস কিম্বা বাঙ্গালোর কিম্বা মাইসোরে এদের জানাশোনা কারো বড়ো অফিস থাকতে পারে।

—দূর ! এদেশে কি ছেলের অভাব আছে যে আমাদের মতো দুটো উটকো ছেলেকে চাকরির জন্যে বলবে ?

কথা বলতে বলতে ওরা সেই দোকানগুলোর কাছে এসে পড়ল। কিন্তু দেখল একটা দোকানও খোলা নেই।

—আশ্চর্য।

রঞ্জু বললে, আশ্চর্য আর কি ! বৃষ্টি বাদলায় বাবুরা দোকান খোলেন নি। শুধু শুধু আমাদের হয়রানি।

বাপ্পা এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল, হঠাৎ চোখে পড়ল উলটো দিক থেকে একটা টাঙ্গা আসছে।

এখানে আবার টাঙ্গা আছে নাকি ?

টাঙ্গাটা এসে এসে তাদের সামনে দাঁড়ালো। গাড়োয়ানের মাথায় অদ্ভুত একটা রঙীন উঁচু টুপি। হেসে ওদের উঠতে ইশারা করল। কেউ কারো ভাষা বোঝে না এইটেই মস্ত বড়ো অসুবিধে। তবু গাড়োয়ান বুঝিয়ে দিল তাদের জন্যই টাঙ্গা এসেছে। এক কিলোমিটার দূরে ওদের গোডাউন। সেখানে ভালো ভালো শার্টিং মজুত করা আছে।

রঞ্জু তড়াক করে টাঙ্গায় উঠে পড়ল। বাপ্পা উঠল ধীরে ধীরে। উঠতেই হবে। না উঠে এখন উপায় নেই।

এদিকে বিকেল ফুরিয়ে সন্ধ্যে নামল। আকাশে আবার মেঘ। চারিদিক অন্ধকার। থম্‌থমে। ছেলেদুটো তো এখনো ফিরছে না। বাবার মন চঞ্চল। মা ছট্‌ফট্‌ করছে। দেখতে দেখতে সাতটা বাজল। আশ্চর্য ! এখনো ওদের দেখা নেই। কত দূর সেই কাপড়ের দোকান ?

রঞ্জুর বাবা সারা বগিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এর ওর সঙ্গে কথা বলছেন। কিন্তু মন বসছে না। ফিরে আসছেন নিজেদের খুপরিতে। এখনো ফেরেনি ? মায়ের মুখ কালিবর্ণ। কি হল ? কোথায় গেল ? এত দেরি তো করার কথা নয়। অন্ধকার রাত অচেনা জায়গা—

রাত সাড়ে সাতটা। রঞ্জুর বাবা আর গাড়ির মধ্যে থাকতে পারলেন না। নেমে পড়লেন প্ল্যাটফর্মে। টর্চ ফেলতে লাগলেন রাস্তায় যদি ওদের দেখা যায়।

আর কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত গাড়ি ছড়িয়ে পড়ল কথাটা—বাপ্পা রঞ্জু হারিয়ে গেছে। এখন আর গাড়িতে কেউ পা গুটিয়ে বসে নেই। সবাই নেমে পড়েছে প্ল্যাটফর্মে।—চলুন, খুঁজতে বেরোই। নইলে দেরি হয়ে যাবে।

এঁদের মধ্যে একজন পুলিস অফিসার ছিলেন। সস্ত্রীক দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে গিয়েছিলেন। লম্বা চওড়া চেহারা। তিনিই এগিয়ে এলেন।—কি ব্যাপার আমায় তো একটু বলবেন।

রঞ্জুর বাবা কাঁদো কাঁদো হয়ে সব ঘটনা খুলে বললেন। পুলিস অফিসার সব শুনে বললেন, এখানে বেশ কিছু স্মাগলার আছে। সাংঘাতিক তারা। শুনেছি অল্পবয়সী ছেলেদের চুরি করে

আটকে রাখে। তারপর তাদের দিয়ে স্মাগলিং-এর কাজ করায়। যাই হোক, এখনি আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। কোন্‌পথে গেছে জানেন?

রঞ্জুর বাবা হতাশ হয়ে মাথা নাড়লেন। —কিচ্ছু জানি না—কিচ্ছু জানি না।

এমনি সময়ে সেই ঠাকুর এসে একটা কাগজ দিল। খোকাবাবু দিয়ে গেছে।.

কাগজ খুলে পুলিস অফিসার বলে উঠলেন বাঃ! এইতো ডিরেকসান। দাঁড়ান, রিভলভারটা নিয়ে আসি। টর্চ?

সঙ্গে সঙ্গে জন কুড়ি প্যাসেঞ্জারের হাতে টর্চ জ্বলে উঠল।

পুলিস অফিসার তখনই রেডি হয়ে নেমে এলেন। আসুন আপনারা। Quick! ঘড়িতে তখন আটটা বেজে পনেরো মিনিট।

অন্ধকার একটা ঘরের মতো জায়গায় বাপ্পা আর রঞ্জু তখন চুপচাপ বসে। স্যাঁতসেঁতে মাটি। ঘরটা যে মাটির নীচে তা বুঝতে বাকি ছিল না। একটা ভাঙা সিঁড়ি আছে ওপরে ওঠার। কিন্তু সিঁড়ির মুখ বন্ধ। কিসে বন্ধ তা এখন ঠাওর হয় না। টাঙ্গা থেকে কখন যে কীভাবে নেমেছে, কারা নামিয়েছে, তাও খেয়াল নেই। মাথাটা এখনো ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। স্টেশন থেকে এ জায়গাটা কতদূরে কে জানে। রাতই বা এখন কত? তাদের গাড়ি কি ছেড়ে গিয়েছে? রঞ্জু প্রথমে খুব চিৎকার করেছিল যদি কেউ শুনতে পায়। কিন্তু এখন আর চেঁচাতে পারছে না। ফুঁপিয়ে কাঁদছে উঃ মা! মাগো!

বাপ্পার চোখে জল নেই, গলায় টুঁশব্দ নেই। মাঝে মাঝে ঘুরে ঘুরে দেখছে জায়গাটা। ভাগ্যিস টর্চটা এনেছিল। নাঃ, বেরোবার কোনো উপায় নেই। এইখানেই সারা রাত্রি হয়তো পরের দিন কি তার পরের দিনও মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হবে। ঠিক কারা তাদের ধরে নিয়ে এল, কেন আনল, গেলই বা কোথায় বাপ্পা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না। তার শরীর খুব ঘামতে লাগল আর শরীর এলিয়ে পড়তে লাগল। অজ্ঞান হবার আগে মানুষের কি এইরকম অবস্থা হয়?

হঠাৎ এই সময়ে ওপরে কুকুরের ডাক শোনা গেল—ঘে—উ!

শব্দটা খুব চাপা। যেন বহুদূর থেকে আসছে। আবার সেই ডাক—ঘে-উ-উ! এবার যেন খুব কাছে। সিঁড়ির ওপরে। বাপ্পা কান খাড়া করে উঠে বসল। এবার মনে হল সিঁড়ির মুখে কুকুরটা যেন আঁচড়াচ্ছে। আবার শব্দ ঘে-উ! —রঞ্জু; আমাদের সেই কুকুরটা! বলে বাপ্পা রঞ্জুর হাত ধরে এক টান দিল। —আ তুঃ! কুকুরটার ডাকে সাড়া দিতে চেষ্টা করল বাপ্পা। কিন্তু এদের ক্লান্ত স্বর বাইরে বেরোল না। ছিটকে ফিরে এল।

কুকুরটা তখনো পা দিয়ে কিছু একটা সরাবার চেষ্টা করছিল। বাপ্পা কোমরে গোঁজা গুলতি বের করে দুটো বাঁটুল ছুঁড়ল। যদি কুকুরটা বুঝতে পারে। খট্‌ খট্‌ করে কিসে যেন লাগল। চূর্ণ মাটি ঝরে পড়ল। তারপর সব চুপ সব শান্ত। আর মাটি আঁচড়ানোর শব্দ নেই—কুকুরের ডাকও নেই।

—হায় হায় রঞ্জুরে! কী ভুলই করলাম। কুকুরটা শব্দ শুনে নিশ্চয় ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে। বলে বাপ্পা দু হাতে মুঠো করে নিজের মাথার চুল টানতে লাগল!

—আর মাত্র এক ঘণ্টা সময় ট্রেন ছাড়তে। Quick—Quick ! পুলিস অফিসার হাঁক দিলেন। Quick তো ! কিন্তু নক্‌শার চিহ্ন এই পর্যন্তই। এইতো সেই দোকানগুলো। সব দোকানই বন্ধ। জনপ্রাণীর সাড়া নেই। কোথায় খুঁজবে ওদের ?

—দাঁড়ালে হবে না। চলুন এগোই। যা হোক একটা সূত্র পাওয়া যাবেই।

কিন্তু হায় ! কোন্ দিকে এগোবে ? দুদিকে দুটো রাস্তা চলে গেছে যে।

এক মুহূর্ত পুলিস অফিসার থমকে দাঁড়ালেন। তারপরই বললেন দশ জন বাঁ দিকে যান্, আর দশ জন আমার সঙ্গে আসুন।

সেইরকমই করার জন্যে দুটো ব্যাচ তৈরী হচ্ছে হঠাৎ দেখা গেল দূরে অন্ধকারে হিংস্র প্রাণীর চোখের মতো কী যেন জ্বলছে ! সবাই শিউরে উঠল। কী ওটা ? পুলিস অফিসার রিভলভার বের করলেন। ইতিমধ্যে সেই জ্বলন্ত চোখ দুটো যেন শূন্যে ভাসতে ভাসতে কাছে এসে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কুড়িটা টর্চের আলো তাকে চারিদিক থেকে বিঁধল।

না, একটা রোগা লিক্‌লিকে কালো কুকুর। কুকুরটা এবার ডাকল না। ওদের পায়ের কাছে একবার ঘুরেই যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে ছুটতে লাগল। আবার ফিরল। আবার ছুটতে লাগল। ক্ষ্যাপা কুকুর নাকি ? লোকে ইঁট-পাটকেল কুড়িয়ে নিল। পুলিস অফিসার ইশারায় ইঁট ছুঁড়তে বারণ করলেন। বললেন, আমায় যেন মনে হচ্ছে কুকুরটা কিছু বলতে চাইছে। Let us follow.

কিছুক্ষণের মধ্যে কুকুরটা তাদের যেখানে এনে ফেলল সেটা পুরনো মস্ত একটা গির্জে। আর তার পাশেই—টর্চের আলো পড়ল—ও বাবাঃ ! এযে কবরখানা।

কুকুরটা কিন্তু থামল না। ওদের একরকম টানতে টানতে নিয়ে এল ভাঙা গির্জের মধ্যে। তারপরে এক জায়গায় যেখানে একটা প্রকাণ্ড কাঠ পড়েছিল সেখানে আঁচড়াতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে কুড়িটা মানুষের চল্লিশটা হাত লেগে পড়ল। কাঠের পাটাতন সরে গেল। ভেতরে সুড়ঙ্গ। ঘুটঘুটে অন্ধকার। হঠাৎ সেই অন্ধকারের মধ্যে থেকে একটা কিশোরের কাঁপা কাঁপা আর্তস্বর ছিটকে বেরিয়ে এল—কে আছ বাঁচাও !

সঙ্গে সঙ্গে টর্চের আলো ঠিকরে পড়ল ভেতরে।—কোন ভয় নেই। আমরা এসে পড়েছি।

তিরুনেলভেলি থেকে ঠিক দশটায় গাড়ি ছেড়েছে। চল্লিশ জন পুরুষ স্ত্রী—কারো চোখে ঘুম নেই। সবাই শুনছে ওদের কথা। শিউরে উঠছে ভয়ে। ভাগ্যি কুকুরটা ছিল !

কিন্তু আশ্চর্য, গির্জে থেকে ফেরার সময়ে কুকুরটাকে আর দেখতে পাওয়া যায় নি। অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

———

[৬২ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

কখনই সমান হত না, হত গোলাকৃতি। তার মানে পাথর সাজিয়ে উঁচু করে রাখা হত এই সব বাসন। এই সময়ে, মনে হয়, মানুষ নতুন এক সহজ পদ্ধতিতে আগুন জ্বালতে শিখেছিল। আগে আদিম প্রস্তর যুগের মানুষ আগুন জ্বালত বটে কিন্তু সে অনেক কষ্টে, শুকনো কাঠ ঘসে ঘসে। এই নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ চক্‌মকি পাথর ঠুকে অনেক সহজে আগুন জ্বেলে ফেলল।

এদিকে সেই লোকটির মত আরও কতগুলি লোক ছোট ছোট কুড়েঘর বানিয়ে ফেলেছে আশেপাশে। সব মিলিয়ে তৈরী হয়ে গেছে একটি গ্রাম। বুনো জন্তুদের তাড়াবার জন্যে তার চারদিকে উঠেছে একটা দেওয়াল।

এই সব গ্রামে যে লোকটি সবচেয়ে শক্তিশালী আর বুদ্ধিমান সেই হত মোড়ল বা দলের মাথা।

আর রাস্তা তৈরী হল কী ভাবে? তখন তো আর এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাবার বাঁধানো রাস্তা ছিল না। এই নতুন যুগের মানুষ গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাতায়াত শুরু করল জিনিসপত্র আদান-প্রদান করতে। একই পথে বারবার যাতায়াতের ফলে প্রস্তুত হল রাস্তা, অবশ্য পায়ে চলা পথ।

তারপর আবার একদিন দুর্গও তৈরী হল। হয়তো কোন ভিনজাতীয় মানুষ গরু বাছুর চুরি করতে এসেছিল, এদের গ্রামে। তখন এরা প্রয়োজন বোধ করল শক্ত দেওয়ালের। আর চারপাশে খনন করল গভীর পরিখা। সাধারণত এই প্রাচীন দুর্গগুলো তৈরী হত পাহাড় পর্বতের উপরে।

যখন কোন গ্রামনেতার মৃত্যু হত, তাকে সসম্মানে কবরস্থ করার দরকার বোধ করত এরা। পাথর সাজিয়ে সাজিয়ে কুটির তৈরি করে দেহখানি শুইয়ে দিত এরা। সঙ্গে তাঁর অস্ত্রশস্ত্র আর গয়না গাঁটিও রেখে যেত।

এমনি করে, যদিও সেই সব প্রাচীন মানুষ নিজেদের কাহিনী কিছুই লিখে যেতে পারেনি, আমরা কিন্তু তাদের অনেক কথাই জেনে গেছি।

এর পেছনে অবশ্য আছে পুরাতত্ত্ববিদদের খাটুনি। পুরাতত্ত্ববিদ হলেন কারা জান? যাঁরা পুরনো ঐতিহাসিক জায়গায় ভগ্নাবশেষ খুঁজে বার করেন। সুতরাং, দেখতেই পাচ্ছ, আদিম মানুষ যাদের আমরা অসভ্য বলি, তারা ঠিক অসভ্য ছিল না। ছোট ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অনেক আবিষ্কার করেছিল তারা যেমন মাটির বাসন গড়তে শিখেছিল কিংবা কাঠের গুঁড়ি দিয়ে রোলার তৈরি করতে। এরই সাহায্যে গড়িয়ে গড়িয়ে এনেছিল পাথরগুলো। এমনি করেই না একদিন আমাদের এই বিরাট সভ্যতার শুরু হয়েছিল।

জান কি?

চিঠি ● চিঠি ● এবং জবাব

তোমাদের লেখা জানা অজানা প্রশ্ন আমাদের দপ্তরে পাঠাতে পার! প্রশ্নের উত্তর আগামী সংখ্যায়ই পাবে। - নন্দিতা বসু

মনুষ্য শরীরের কথা

মানুষের দেহে কতগুলি হাড় আছে?

২০৬টি

সুস্থ ব্যক্তির নাড়ীর স্পন্দন মিনিটে কত বার?

৭২ হইতে ৮০ বার।

সুস্থ ব্যক্তি মিনিটে কতবার শ্বাস-প্রশ্বাস লয়?

১৮ বার।

পঞ্চ ইন্দ্রিয় কি কি?

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক।

পূর্ণ বয়স্ক মানুষের কতগুলি দাঁত আছে?

দুই পাটিতে ৩২টি।

সুস্থ ব্যক্তির শরীরের তাপ কত?

৯৭·৪ ডিগ্রী (ফারেনহাইট)।

শব্দ মালা | বিষ্ণু দত্ত

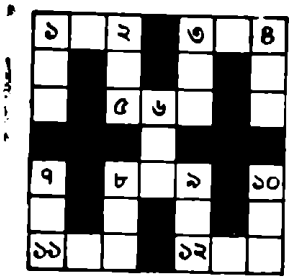

দেখ : পাশাপাশি : (১) বেড়াল (৩) খেলার জিনিস (৫) গায়ে গতরে (৮) গল্প সংগ্রহ গ্রন্থ (১১) সাদা (১২) রসজ্ঞ :
উপরে-নীচে : (১) কুটির শিল্পে উদ্ভিদ উপাদান (২) বাংলা ভাষায় এক্স-রের নাম (৩) আকাশচারী (৭) বিষয় অভিনয় (৬) অর্জুন যার সাহায্যে লক্ষ্যভেদ করেছিলেন। (৭) বটগাছ (৮) শহর ও রাজধানী এক (৯) তরল পদার্থের মাপ (১০) পেঁচা।

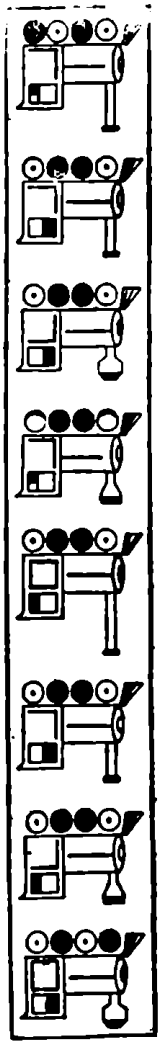

অনুসন্ধান/চন্দন বসু

তোমার চোখের বাঁপাশের ছবিটিতে দেখতে পাচ্ছ আটটি রেলগাড়ির এঞ্জিন। এদের মধ্যে কোথায় মিল দেখছো বার করো। দুটো এঞ্জিন একই রকম খুঁজে বার করার জন্য প্রশ্ন করলাম।
উত্তর পাঠাও।

নাম _____

ঠিকানা _____

_____

বুদ্ধির খেলা | রেখা রক্ষিত

তোমাদের ডান পাশের ছবিটিতে দেখতে পাচ্ছ নিচে 'শুরু' লেখা উপরে ডান পাশে 'শেষ' লেখা। এখন তোমাদের পেনসিল বা কলম নিয়ে বসে পড়। শুরু লেখা থেকে আরম্ভ করতে হবে। সাদা ঘর দিয়ে সোজা যেতে হবে, বাঁকলে হবে না, শেষ পর্যন্ত। সোজা লাইন দিয়ে আঁক কেটে শেষ করো। দেখ নিশ্চই পারবে।

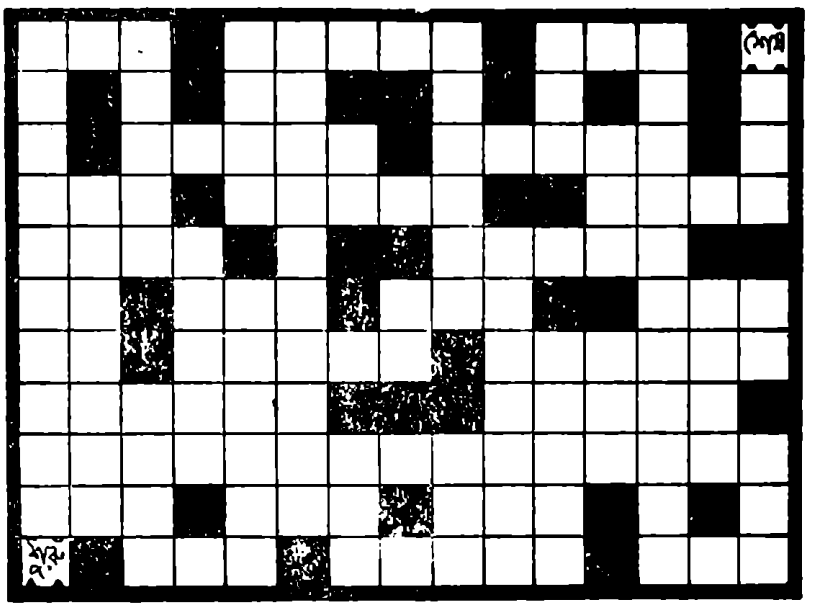

শুভতারা

সব বয়সের ছোটদের উপন্যাস, গল্প, সায়েন্স ফিক্‌শান, ডিটেকটিভ, কমিকস সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—অমিতাভ সেন

এজেন্সীর নিয়মাবলী

সবিনয় নিবেদন,

আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, উপন্যাস, গল্প, সায়েন্স ফিক-শান ডিটেকটিভ সচিত্র মাসিক পত্রিকা "শুভতারা" নিয়মিত প্রকাশিত হবে। বাংলার বিখ্যাত সাহিত্যিকদের সম্পূর্ণ গল্প, উপন্যাস ও অন্যান্য রচনায় সমৃদ্ধ"শুভতারা"-র প্রতিটি সংখ্যা। সর্বাধুনিক কমিকস ও ছবি এর অন্যতম আকর্ষণ। কলকাতায় প্রকাশিত হওয়ার দিন একসঙ্গে পত্রিকা পাবার জন্য ৫ দিন আগে ভি. পি. করা হচ্ছে। প্রতি সাধারণ সংখ্যার দাম ২-৫০।

কমপক্ষে ৫ কপির অর্ডার দেবেন।

* ভি পি তে পত্রিকা পাঠানো হচ্ছে।
* প্রতি কপির দাম ২-৫০ পয়সা।
* এজেন্সির কমিশন ২৫%।
* কমিশন বাদ দিয়ে বাকী টাকা ভি পি করা হয়।
* ভি পি খরচ আমরা বহন করছি।
* প্রয়োজনীয় কপির সংখ্যা বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে। আলাদা নির্দেশ না থাকলে, পরের মাসে সেই সংখ্যক কপিই পাঠান হবে।

শারদ সংখ্যা রচনা ও আলোকচিত্র সম্ভারে, আটটি প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের উপন্যাস, সাতটি বড় গল্প বেতালের মত কমিক্‌স শতাধিক ছবি, সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হবে।

প্রতি সংখ্যায় থাকছে *
একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের একটি লেখা।
১৬ পৃষ্ঠা ছবি, কমিক্‌স, গল্প, প্রবন্ধ।
শুভতারা ২৭ বৌবাজার স্ট্রীট, কলি-১২

আগামী সংখ্যা আগষ্টের প্রথমে

শুভতারা ২·৫০ ॥ দুটাকা পঞ্চাশ

তোমাদের জন্য নামী লেখকদের উপন্যাস, গল্প

সেরা ৪টি কমিক্স সঙ্গে সচিত্র খেলাধুলা

এ ছাড়া আকর্ষনীয় বিভাগ ও অন্যান্য রচনা

অ্যাডভেঞ্চার, শিকার, কল্পবিজ্ঞান, মজার ছবি

জাদুকর ওজ এবং গুপ্তধনের রহস্যে খোকা গোয়েন্দা

সঙ্গে আরও অনেক আকর্ষণ

পড়ার টেবিল কি রকম হবে? ঠিক-বেঠিক-স্থির করে উত্তর দাও!

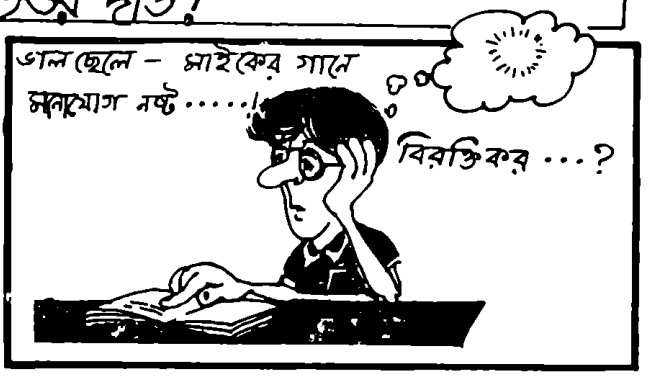

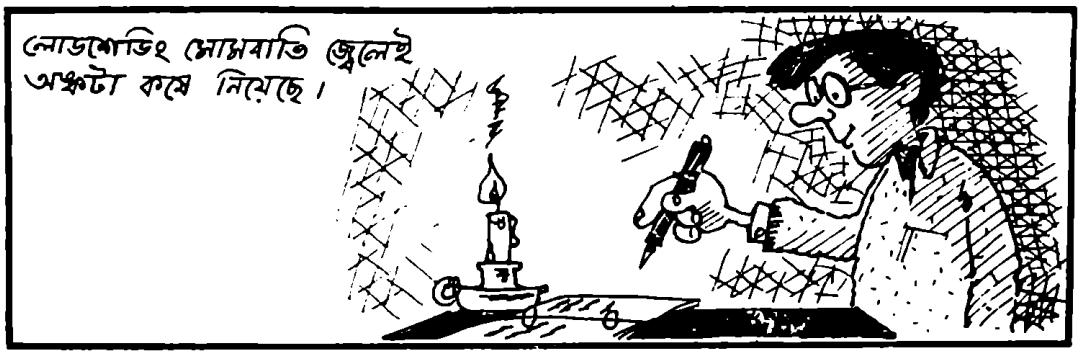

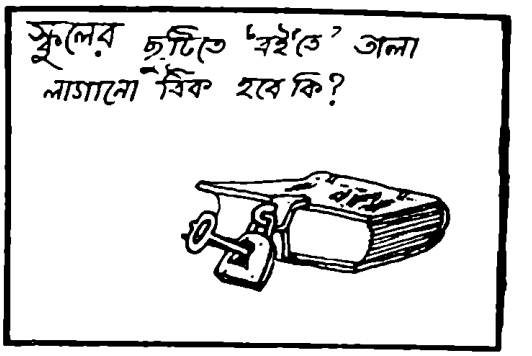

SUBHATARA
JULY 1983
Regd. No. WB CE 117/83

শুভতারা